সংগ্রামী

এটি শুধু আমার ট্রেনে চড়ার অভিজ্ঞতা নয়, চরম অভিজ্ঞতাও বটে। আমার জীবনকে শেষ করে দেয়ার অভিজ্ঞতা। একমাত্র যায়যায়দিনকে সেই কথা বলা যায়। আমি পুরনো পাঠিকা যায়যায়দিনের। অত্যন্ত আপন এই পত্রিকাটি প্রতিবার কেনার সময় সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুটি পাশে থাকে আমার। হিংসায় সে জ্বলে পুড়ে মরে। বলে, কি আছে ওতে যা আমার নেই?

বন্ধুটিকে বলতে পারি না, প্রিয় বন্ধু, আমার যে কথা তোমাকে বলা যায় না, যে কথা কাউকেও বলা যায় না সেই কথা যায়যায়দিনকে বলা যায়।

১৯৮৪ সাল। সম্ভ্রান্ত এক গোড়া মুসলিম পরিবারে বিয়ে হয় আমার। স্বামী দশ দিন পরেই ফিরে চলে যায় কর্মস্থলে।

সউদিতে কর্মরত চার বছর পর পর সে দেশে আসে। আমি শ্বশুর শাশুড়ি ও তার ভাইবোনদের নিয়ে সুখে দিন কাটাতে লাগলাম। অল্প বয়স আমার। সুন্দর স্বামী প্রাপ্তি, সুন্দর পরিবার এবং আমি এতো বেশি খুশি ছিলাম যে সব কিছুর ওপর স্বামীর সঙ্গ পাবার শূন্যতা ছাড়া আমার আর কিছুর অভাব থাকলো না।

রোজ সারা দিনের সব কাজ সেরে গভীর রাতে তাকে চিঠি লেখা আমার জীবনে সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত বলে মনে করতাম। সারা দিনের সব কাজের ভার আমার ওপর দিয়ে তারাও নিশ্চিন্ত ছিল। আনন্দে তার আসার দিন গুণতাম। ভোর পাচটায় সবাই উঠতাম। নামাজ পড়ে সবার নাশতা বানানো দিয়ে দিন শুরু হতো আমার। ক্লান্তি ছিল না আমার। সুখী ছিল তারাও আমাকে নিয়ে।

রোজ তার চিঠি আসতো। আমিও রোজ পোস্ট করতাম। আনন্দে ভাসতে থাকলাম।

কিন্তু সুখ বড় ক্ষণস্থায়ী। আমার দেবর অর্থাৎ তাদের দ্বিতীয় সন্তানটি প্রায় আমারই বয়সী। হঠাৎ তার মধ্যে কু-প্রবৃত্তি নাড়াচাড়া দিল। সহানুভূতির ছলে ঘরে এসে যখন-তখন হানা দিতো।

ভয়ে আর দুর্ভাবনায় দিশাহারা হলাম।

সম্ভ্রান্ত পরিবারের মমতাময়ী *মা*-কে বাধ্য হলাম এক সময় খুলে বলতে।

তিনি প্রথমে অবাক। পরে পরামর্শ দিলেন, সাবধানে থেকো। সব সময় ঘরে দরজা বন্ধ করে রেখো।

হালকা তিরস্কারও করলেন তার সেই সন্তানকে।

হয়তো এটাই হলো আমার ভুল। কুসন্তানটি ক্ষেপে উঠলো। তার আসল চেহারা, তার মা-বাবা কেন জানলো? জ্বালাতন বেড়ে গেল।

শ্বশুরও তাকে নিষেধ করলেন। কিন্তু সেই ভাইটি তার প্রবাসী বড় ভাইকে চিঠিতে কি জানালো জানি না। প্রবাসের সেই সুন্দর ভালোবাসা ভরা চিঠি আসা বন্ধ হলো।

আমাকে লেখার পরিবর্তে বাবা-মায়ের কাছে সে চিঠি লিখলো, *বের করে দাও ওই মেয়েকে আমার বাড়ি থেকে। যে বুকে মাথা রেখে আমি শান্তি পেতে চাই সেই বুক সে কি করে বাড়িয়ে দেয় আমার ছোট ভাইয়ের দিকে?*

আমার কোনো কথাই শোনা হলো না। পরিবারের প্রথম ও প্রবাসী সন্তানের কথা রক্ষা হলো। আমাকে বাপের বাড়িতে সেই রাতেই পাঠানো হলো।

কাদলাম আর কাদলাম। যে মেয়েটি হেসে হেসে পরিবারের সকলের জন্য কাজকর্ম করতো, এক নিমেষেই পরিবারের সবাই তার ওপর অনায়াসে মন উঠিয়ে ফেললো।

প্রবাসে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম। যেকোনো মফস্বল শহর থেকে চিঠি পোস্ট করলে বিদেশে সেই চিঠি যেতে সময় লাগতো প্রায় এক মাস। ব্যর্থ হলাম তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে সময় মতো।

এরই মধ্যে তাদের এক দুঃসম্পর্কের চাচাতো ভাই আমাদের বাড়ি বেড়াতে এলো। ওদের ওখানে নয় মাস থাকার সময় ওই ভাইকে আসতে দেখেছি ওই বাড়িতে অনেকবার। হাসি–খুশি, প্রাণবন্ত ও ধনী মানুষ হিসেবে ওনাকে সবাই চিনতো।

তিনি আমাদের বাড়িতে আসাতে প্রাণ ফিরে পাই। এসে কিছু কথার পর জানালেন যে, তিনি আমাকে নিতে এসেছেন। ওই সংসারে যাতে আমি ফেরত যাই সে জন্য তিনি সব রকম চেষ্টা করবেন।

তিনি প্রভাবশালী ছিলেন বলে সবাই ওনাকে মেনে চলতো।

আমারও মনে বিরাট আশা হলো যে, আমার আর ভয় রইলো না।

আমরা সৈয়দপুর এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

আমার মা কাদলেন।

আমি কাদলাম।

দূরত্ব বেশি হওয়ায় এয়ারপোর্টে পৌছে দেখি প্লেন আমাদের আসার আগেই ছেড়ে দিয়েছে।

তিনি একটুও হতাশ না হয়ে বললেন, চিন্তার কিছু নেই। চলো ট্রেনে যাই।

আমি তখন আসন্ন স্বামী হারানোর ভয়, সংসার হারানোর ভয় এবং ওই সংসারে ফিরে যাবার আনন্দে দিশাহারা।

আমরা সৈয়দপুর থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ট্রেনে উঠলাম দুপুরে। সন্ধ্যার পর ঘাটে এসে ট্রেন থামলো। এরপর স্টিমার। এপারে আবার ট্রেন। সব রাতের ব্যাপার। এপারে এসে ট্রেনে উঠলাম।

রাত গভীর তখন। আমার শরীর ভালো না। উল্টোপাল্টা জার্নির জন্য পেটেও ব্যথা। রুমে আমরা শুধু দুজন। আমার ভয় হতে থাকলো। এমনি করে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ ঘুম ভাঙলো। টের পেলাম আমার গায়ে হাত দিচ্ছেন দেবতুল্য ভাইয়া। জোরে তাকে ধাক্কা দিয়ে সোজা হয়ে বসলাম। চিৎকার করে উঠলাম। বললাম, আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। ফিরে যেতে চাই ওই সংসারে। বাচান দয়া করে।

তিনি শক্ত করে আমাকে চেপে ধরলেন এবং বললেন, সারাটা রাত নিজেকে সংযমের মধ্যে রেখেছি। তোমার মতো একটা মেয়েকে একা পেয়ে বসে থাকবো?

তিনি অমানুষের মতো আচরণ শুরু করলেন।

নিরুপায় হয়ে বললাম, ভাইয়া, আমার শরীর ভালো না। আমাকে ছোবেন না। আমি সুস্থ নই।

কিন্তু না। যে মানুষটা সকাল থেকে আমার সহযাত্রী হিসেবে জোহর, আসর, মাগরিব এবং এশার নামাজ পড়েছেন নিয়ম মতো সেই মানুষটাই তার লালসা সারা রাত ধরে মেটালেন আমার শরীরের ওপর দিয়ে। ট্রেন যতো জোরে চলে, ওনার অত্যাচারের পালা বাড়ে।

নিঃশব্দ রাতে ট্রেনের ঝিক ঝিক শব্দে মিলিয়ে গেল আমার চিৎকার। রক্তাক্ত হলাম। ক্লান্ত হলাম, নষ্ট হলাম। এবং সব হারালাম, সব কিছু।

এরপরের গল্প খুব সংক্ষিপ্ত।

আমাকে ডিভোর্স দেয়া হলো। চরিত্রহীনা হিসেবে ঢুকতে দেয়া হলো না ওই বাড়িতে। বড় ভাইয়ের সঙ্গে ট্রেনে *ইচ্ছাকৃত* রাতি যাপনের বিকৃত কাহিনী অজানা রইলো না প্রবাসেও।

একা ফিরে এলাম মায়ের বাড়িতে মরার তীব্র আকাঙ্ক্ষায়।

বোধহয় বেচে থাকার সাধ আরো তীব্র। আমার বেচে থাকতে ইচ্ছে হলো। এক সময় ঢাকায় এলাম চাকরি নিয়ে। এক আত্মীয়ের সাহায্যে প্রথমে ছোট চাকরি, পরে বড় চাকরি এবং সংগ্রাম শুরু হলো।

জীবনের একুশ বছর পর আমি একজন সফল নারী। সভ্রান্ত কি না জানি না। কিন্তু সচ্ছল পরিবারের এক ভদ্র সন্তানের বিবাহিতা স্ত্রী, গর্বিতা মা। সচ্ছলতা আমার চারপাশে।

ট্রেনে উঠতে অনেক দিন ভয় পেয়েছি। নামাজ পড়া মানুষ দেখে অনেক দিন ভয় পেয়েছি। সারাক্ষণ ভয় পেয়ে পেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। এখন নারীবাদী আন্দোলনে অংশ নিই।

এখন সমাজের এই নোংরা নিয়ম দুমড়ে-মুচড়ে ফেলতে পারি অনায়াসে।

এখন ট্রেনে চড়ে প্রায়ই দিল্লি, মাদ্রাজ যাই। তবে ট্রেনে একাকী অন্ধকারে আমার জীবনের সেই দুঃস্বপ্নের দৃশ্য কল্পনা করে এখনো শিউরে উঠি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

টিকেট বিহীন যাত্রী

– মুক্তা রহমান

লালমাই রেলস্টেশনের গাঘেষে বাসন্তীপুরের ছোট্ট ঘরে আমার স্বর্গ। ঘরের সব কিছু ট্রেনের ঝিকঝিক শব্দের তালে নেচে ওঠে। কুউ-উ হুইসলের শব্দে জেগে ওঠে গ্রাম। ফেরিওয়ালা আর হকারদের সুরেলা আওয়াজে জমে ওঠে পসার। ঢঙ ঢঙ স্টেশনের ঘণ্টা শুনতে শুনতে চোখ জুড়ে নেমে আসে স্বপ্ন।

জন্ম থেকে ট্রেন দেখে অভ্যস্ত। চোখে ট্রেনের স্বপ্ন ছাড়া অন্য সব কিছু যেন বেমানান। মা বলতেন, শিশু বয়সে ট্রেনের শব্দে আমার কান্না থেমে যেতো।

ট্রেনের সঙ্গে ছোটাছুটির প্রতিযোগিতা ছিল শৈশবের খেলা। তখন স্বপ্ন ছিল ট্রেনের চালক হবো। এতো বড় ট্রেনটাকে হুস হুস করে চালিয়ে চাদে চলে যাবো।

কৈশোরে ট্রেনের নানান রহস্য, কল্পকাহিনী নিয়ে মেতে ছিলাম। কল্পনায় *দস্যু বনহুর, দুঃসাহসী বাহরাম* বা *মাসুদ রানা* হয়ে পুরো ট্রেনের খারাপ যাত্রীদের পর্যুদস্ত করে ফেলতাম।

এখন জীবন চলছে ট্রেন বিষয়ক স্বপ্ন ফেরি করে। ট্রেনের দিকে তাকিয়ে দেখি রূপসী আর অপ্সরীদের উড়ন্ত চুল। ভাবি, আহা, যদি ছুয়ে দিতে পারতাম! দীর্ঘশ্বাস ফেলি এবং ভাবি সেই দিনগুলোর কথা যখন আমার ঠিকানা ছিল লোকাল ট্রেনের ভিড়ের ভারে নুয়ে পড়া বগিগুলো, যেখানে আমি সঞ্চয় করেছিলাম মানব সমুদ্রে ঝাপ দিয়ে ঠাই করে নেয়ার অভিজ্ঞতা, কোনো কোমল দেহের সুখ স্পর্শে শিহরিত হওয়ার আস্বাদন।

জানালার পাশে সিট পেয়ে লটারি জয়ের আনন্দ। আবার সেই সিট কোনো সুন্দরী যাত্রীর জন্য বিসর্জন দিয়ে রোমাঞ্চিত হওয়ার সুযোগ। কোনো বৃদ্ধ বা শিশু যাত্রীদের একটু স্বস্তি দিতে পারার মাঝে যুদ্ধ জয়ের তৃপ্তি। শিশুসহ মায়ের বসার সুযোগ দিয়ে পেয়েছি হাজারো সকৃতজ্ঞ চাহনি। সর্বোপরি পেয়েছিলাম ট্রেন ভ্রমণের এক অনাবিল আনন্দ।

তবে এখন সবই অতীত। যে ঘটনা আমার জীবনের সব কিছুকে অতীত করে দিয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরলাম।

তখন ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হয়েছি। লালমাই থেকে চার স্টেশন দূরে অবস্থান। আমরা ছয়জনের একটা গ্রুপ লালঘাট স্টেশন থেকে ট্রেনে চড়তাম। আমরা ছিলাম টিকেট বিহীন মাস্তান যাত্রী। কোনো ক্লাসের বাছবিচার ছিল না। তবে যাত্রী সেবার একটা মনোভাব সব সময় কাজ করতেন।

টিকেট কেটে ট্রেনে চড়া ছিল ছাত্রত্বের অপমান। টিকেট চেকাররাও আমাদের ঘাটাতে সাহস করতো না। কথায় কথায় আমাদের মাঝে এক বাজি হয়ে গেল, যে আগে টিকেটধারী যাত্রী হবে তার কাছ থেকে নেয়া হবে দুই তিন সিনেমা দেখার খরচ।

টিকেট ছাড়া আমাদের যাতায়াত নির্বিঘ্নেই চলছিল। হঠাৎ মোবাইল কোর্ট একদিন ট্রেন ঘেরাও করলো। সবাই চোখের নিমেষে কোনদিক দিয়ে কেটে পড়লো বুঝতে না পেরে যেই ট্রেন থেকে নামলাম, এক কালো পুলিশ ধাক্কা মেরে একটা দড়ির বেষ্টনীর মধ্যে দাড় করিয়ে দিল। সামনে টেবিলে বসা ম্যাজিস্ট্রেট। দেড়শ টাকার নিচে জরিমানা করা হচ্ছে না। যারা টাকা দিতে পারছে না তাদেরকেই ঢোকানো হচ্ছিল মুরগির খোয়াড়ের মতো ছোট্ট এক কাঠের ঘরে। ভেতরের লোকগুলোর পা আর অসহায় চোখ ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

ভয়ে আমার পা কাপতে লাগলো, অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। এই খোয়াড়ে ঢোকালে মরে যাবো। তারপর কোর্ট–কাছারি, সবাই জানবে। মুখ দেখাবো কেমন করে! পকেটে মাত্র পনেরো টাকা। বন্ধুদের সব কোথায়? কেউ কি আমাকে বাচাতে পারবে! আর মাত্র দুজন বাকি, তারপরই আমার খোয়াড়ে প্রবেশের পালা। চোখে অন্ধকার দেখছি, পা কাপছে। মনে মনে কামনা করছি ধরণী দ্বিধা হও, আমাকে ধারণ করো।

হঠাৎ বন্ধু অনন্ত এসে পাশে দাড়ালো। হাতে শক্ত একটা কাগজ দিয়ে টেনে সামনে নিয়ে গেল। ম্যাজিস্ট্রেটকে কি বলার পর আমাকে নিয়ে বেষ্টনীর বাইরে বেরিয়ে এলো।

অনন্তকে জড়িয়ে ধরে আল্লাহর শোকর গোজার করলাম।

অন্য বন্ধুরা এগিয়ে এলো।

এতোক্ষণে স্বাভাবিক হতে লাগলাম।

সবাই আমার বোকামি নিয়ে হাসাহাসি করতে লাগলো।

বললাম, অনন্ত তো বাজি হেরে গেল।

সে হেসে বললো, দুর, আমি গাধা নাকি, এই টিকেট দুটো তো ওই চাচা, চাচির। তারপর ওই দুটো এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের হাতে ফিরিয়ে দিল।

ফিরতি ট্রেনে বাড়ি আসার সময় মনটা খুত খুত করতে লাগলো।

সবাই বলাবলি করছিল, আজ সবকটা স্টেশনেই মোবাইল বসেছে। ট্রেনে ওঠার পর সব যাত্রীদের মুখে এক কথা, সামনের স্টেশনে মোবাইল আছেই আছে।

খুব ভয় পেয়ে গেলাম। এবার ধরা পড়ে বোকা সাজতে পারবো না।

অনন্তকে বললাম, এবার কি করবো!

সে বললো, ট্রেন স্টেশনের ঢোকার আগেই নেমে যেতে হবে।

সবাই ট্রেনের হ্যান্ডল ধরে রেডি হতে থাকলাম। সামনে সিগন্যাল বাতি তার আগেই নামতে হবে।

কে যেন চিৎকার দিল, সাবধান!

মাথাটা ভেতরে আনতে গিয়ে পা দুটো বেরিয়ে পড়লো। শরীরে একটা ঝাকুনি খেলাম। তারপর হাসপাতালের বেডে।

এখন আমি ক্রাচে ভর দিয়ে স্টেশনে ছুটে যাই। সকলকে উপদেশ দিই, টিকেট বিহীন যাত্রী হবেন না। আমার অনেক স্বপ্ন ছিল ট্রেনে চড়ে সারা বিশ্ব ঘুরে বেড়াবো। কিন্তু পা দুটোকে ট্রেনের সিড়ি পর্যন্ত উচু করতে বার বার ব্যর্থ হই।

মতিঝিল, ঢাকা থেকে

দ্বীপ কন্যার ট্রেন ভ্রমণ

–তানিয়া সুলতানা রিমা

ঝিকঝিক ... ঝিকঝিক ... ঝিকঝিক ... ছুটে চলছে ট্রেন। ট্রেনের ভেতরে ছোট্ট ছিমছাম একটি রুম। রুমের ভেতরে ছোট্ট একটা বিছানা। তাতে নীল বেডশিট পরিপাটি করে বিছানো। জানালায় নীল রঙের পর্দা ঝুলছে। পর্দা সরালেই চোখে পরে শাদা কাশবন, নীল আকাশে শাদা মেঘের ভেলা আবার কখনো বা পর্দা সরালেই চোখে পড়ে স্নিগ্ধ রাতের আকাশ অনন্ত নক্ষত্রমালা কিংবা জ্যোৎস্নায় প্লাবিত মায়াবী প্রকৃতি। ঘুম পেলেই তুলতুলে নরম বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে ট্রেনের ছন্দময় ঝিকঝিক ... ঝিকঝিক ... শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি।

এ রকম অদ্ভুত সুন্দর অসংখ্য স্বপ্নের কথা কতোবার যে মনে মনে কল্পনা করেছি!

আমি এক দ্বীপকন্যা। আমার চারপাশের মাটি খুব নরম বলে এখানে ট্রেনের রাস্তা তৈরি করা সম্ভব নয়। তাই তো ট্রেন ভ্রমণ আমার কাছে আজো কল্পনাই থেকে গেল।

বই পড়ে আর মুভি দেখেই আমার ভেতরে জন্ম নিয়েছে ট্রেনপ্রীতি। এই ট্রেনপ্রীতির জন্যই মাঝে মধ্যে কল্পনার ডানায় ভর করে ট্রেনে করে চলে যাই দূর–দূরান্তে।

রাজধানীর কর্মব্যস্তময় জীবনে ট্রেন আসার কারণে ট্রেন সিগনালে আটকা পড়লে সবাই মহা বিরক্ত হয়, তখন মহা আনন্দে নেচে ওঠে আমার হৃদয়। খুব কাছ থেকে ট্রেন দেখাটা এনজয় করি আমি আর গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকি, *দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যায়েংগে* ছবির শেষ দৃশ্যের শাহরুখ খানের মতো করে ট্রেনের দরজায় দাড়িয়ে কেউ গভীর আত্মবিশ্বাস ও ভালোবাসা মিশ্রিত হাত আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলো কি না!

চরফ্যাশন, ভোলা থেকে

ইস্তক যাত্রী

- এমএম রেজাউল করিম

হঠাৎ চোখে পড়ে গেল যায়যায়দিনের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে। ট্রেন ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ওপর একটি প্রতিযোগিতা। ছোট গল্প লেখার অভ্যাস নেই। তার উপরে প্রতিযোগিতার জন্য লেখা? মনটা সায় দিল না। কিন্তু পরক্ষণেই সেই একই মন বললো, ট্রেন ভ্রমণে তোমার যে একটি অভিজ্ঞতা প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে সঞ্চয় করেছিলে সেটা কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী বিধায় জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে এবং যায়যায়দিন তারই একটা সুবর্ণ সুযোগ করে দিয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৬০ সালে। আমি তখন প্যারিসে পাকিস্তান দূতাবাসে একজন ইয়াং ডিপ্লম্যাট, তরুণ কূটনীতিবিদ। সেখানে আমার সঙ্গী আরো দুজন সহকর্মীসহ আমরা ফরাশি ভাষা শিখছিলাম। সকালে আলিয়াস ফ্রাসেজ–এ যেতাম আর বিকেলে দূতাবাসে আসতো আমাদের বিশেষ শিক্ষক মসিয়ে দি ব্লকভিল। তিনি তার কর্তব্য পালনে এতোই কঠিন ছিলেন যা আমাদের কাছে অনেকটা নিষ্ঠুরতা বলেই মনে হতো। সবচেয়ে কষ্টকর ছিল ফরাশি ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক *লে মন্দ*–এর কঠিন সম্পাদকীয়, প্রবন্ধগুলোকে অনুবাদ করা। তবে অন্যদিকে তার মন ছিল খুবই কোমল। স্নেহ করতেন আমাদের বেশ। আর মাঝে মধ্যে ফরাশি থিয়েটারে নিয়ে যেতেন। মনে হয় আমাদের পরীক্ষা করতেন, আমরা সত্যিই কি বুঝে আনন্দ লাভ করছিলাম কি না?

সে যাই হোক। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় পক্ষ ছুটি বড়দিনের। আমরা যে যার পছন্দ মতো প্যারিসের বাইরে ছুটলাম। আমি ঠিক করলাম অস্ট্রিয়ার ইন্সব্রুক শহরে যাবো। পরের বছর ইন্সব্রুকে অলিম্পিকের শীতকালীন খেলাধুলার প্রতিযোগিতা। এ বছরেই তার জন্য সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। আমার খুব শখ ছিল বরফের মধ্যে স্কি প্রতিযোগিতা দেখা। যদি নিজেও কষ্টমষ্ট করে খানিকটা স্কি করতে পারতাম! ফিরে আসার সময় জার্মানি ও অন্যান্য আরো দুই একটা দেশ দেখারও ছিল ইচ্ছা।

যথাসময়ে প্যারিসের *গ্যার দি লেস্ত* বা পূর্বদিকের রেলস্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠলাম। প্যারিস প্রাচীন ও ঐতিহ্যপূর্ণ এক বিরাট মহানগর। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত চারটি রেলস্টেশন। যে যেদিকে যাবে সে সেদিকের স্টেশন থেকে উঠবে। শহরের মধ্যে কোনো রেললাইন নেই।

বিরাট ট্রেনটির কয়েকটি বগির ওপর ইন্সব্রুক লেখা ছিল। তারই একটাতে উঠে পড়লাম। ট্রেনটা আসলে জার্মানি হয়ে অস্ট্রিয়ায় যাবে। বেশ সুন্দর একটা সিটে বসলাম।

সে বছর প্যারিস শহরে তখনো বরফ পড়েনি। কিন্তু শহর পার হওয়ার পর পরই বরফের মধ্যে ঢুকে গেলাম। চারদিকে বরফ আর বরফ। গাছপালা, বাড়িঘর সব কিছু বরফে আচ্ছন্ন। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসী হিসেবে দৃশ্যটি খুবই মনোরম ও উপভোগ্য হলো আমার কাছে।

দেখছিলাম ও চিন্তা করছিলাম আগামী দিনগুলোর প্ল্যান নিয়ে। আমাদের দেশের ট্রেনের তুলনায় ট্রেনটি চলছিল অনেক বেগে। তবে বর্তমানে জাপানের *বুলেট* ট্রেনের মতো অতো দ্রুতগামী ছিল না।

দুপুর গড়িয়ে পড়লো। করিডোর দিয়ে গেলাম *রেস্টুরেন্ট কারে*। সবগুলো টেবিল ভর্তি মানুষ। শেষের দুটি টেবিলে একজন পুরুষ ও একটি মেয়ে। পুরুষটি ছিল এক বিরাট বপু জার্মান, সামনে এক মগ বিয়ার। মেয়েটি ছিল মাঝারি আকারের, তন্বী, কম বয়সী। রিসলিং ওয়াইনের গ্লাসে অল্প অল্প চুমুক দিচ্ছিল।

মনটা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মেয়েটির দিকে টেনে নিয়ে গেল। তার টেবিলে মুখোমুখি দাড়ালাম।

স্মিত হাস্যে মেয়েটি মাথা নাড়লো।

বুঝলাম বসতে বললো।

আমাদের দেশে কোনো একটি মেয়ে যদি কোনো পুরুষকে অতোখানি হাসি মুখে অভ্যর্থনা করতো তাহলে অনেকেই অনেক কিছু কল্পনা করলে অস্বাভাবিক হতো না। কিন্তু এসব ইওরোপিয়ান দেশে এই ধরনের হাসি শুধু লৌকিকতা পালন মাত্র, সেটি বোঝার অভিজ্ঞতা আমার ইতিমধ্যেই হয়েছে। বসলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই স্টুয়ার্ড এলো।

খাবার অর্ডার দিলাম।

মেয়েটিও দিল।

রীতি অনুযায়ী স্টুয়ার্ড প্রথমে মেয়েটির অর্ডার নিল, পরে আমার।

কথা শুরু করার সুযোগ খুজছিলাম। তখনো মেয়েদের সঙ্গে বড় একটা সহজ হবার অভিজ্ঞতা লাভ করিনি। কোন বিষয় নিয়ে শুরু করি? বিদ্যাধরদের সুপারিশ অনুসরণ করলাম। আর কোনো বিষয় মনে না এলে আবহাওয়া দিয়ে আলাপ শুরু করা যায়। বাইরে বরফ পড়ছে, বরফে ঢাকা পৃথিবী।

বললাম, কি সুন্দর দৃশ্য। বাইরে খুবই ঠাণ্ডা আর ট্রেনের ভেতর কি সুন্দর গরম।

মেয়েটি তাকালো, অল্প একটু হাসলো।

আবার হাসি? এটাও মনে হলো লৌকিকতা।

পরে আরো দুই একটা কথা বলতে লাগলাম।

মেয়েটি আর হাসলো না, কোনো উত্তরও দিল না। মনে হলো একটা অসহায়ের দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে।

মেয়েটি কি বোবা? খাণিকক্ষণেই বুঝতে পারলাম, আমার বলা ইংরেজি তার বোধগম্য হচ্ছিল না। অনেকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। মনে হলো আমি বড় একটা অপছন্দের পাত্র নই। আমাকে হেয় করার ইচ্ছা তার ছিল না।

খানিকক্ষণের মধ্যেই আবার বুদ্ধি এলো, মেয়েটি নিশ্চয়ই ফরাশি ভাষা জানে, প্যারিস থেকেই তো ট্রেনে উঠলো। মসিয়ে দি ব্লকভিল–এর সকল প্রচেষ্টার সার্থকতার পরীক্ষা এখন। কায়দা দুরস্তভাবে আমার সদ্য অর্জিত ফরাশি ভাষার জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করতে শুরু করলাম।

মেয়েটি থেকে তখনো কোনো সাড়াশব্দ নেই। তবে সত্যিই কি সে কথা বলতে পারে না? তাও তো হবার নয়। রেস্টুরেন্টের স্টুয়ার্ডকে সে খাবারের অর্ডার দিয়েছিল। কোন ভাষায় দিয়েছিল সেটা লক্ষ্য করিনি।

অপলক দৃষ্টিতে সে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। কিছুটা অসহায় ভাব।

বুঝলাম, ফরাশি ভাষাও তার জানা নেই। সে তাহলে শুধু জার্মান ভাষাই জানে। কারণ সে ইন্সব্রুকের গাড়িতে উঠেছিল এবং অস্ট্রিয়ার প্রচলিত ভাষা হচ্ছে জার্মান ভাষা।

এরপর চললো একটা গোজামিলের মহড়া। কিছুটা কথায়, বেশির ভাগই অঙ্গভঙ্গিতে আমাদের কথোপকথন শুরু হলো। বুঝতে পারলাম, তার বাড়ি ইন্সব্রুকে। মাত্র কয়েকদিন আগে গিয়েছিল প্যারিসে ফরাশি ভাষা শেখার জন্য। কয়েকদিন ক্লাস করার পরেই ছুটিতে সে দেশে যাচ্ছে। তার বাপ–মা, ভাই–বোন সবাই আছে।

এতো সব খবর বেশির ভাগ অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে কি করে সংগ্রহ করলাম সেটি এখনো রহস্যই রয়ে গেছে। মনে আসে সেই বেদবাক্য, *ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়*।

সে যাই হোক। আমাদের বাকশূন্য কথোপকথনে আমরা এমনই নিমগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম, বেলা যে কখন গড়িয়ে পড়েছে তা আমাদের মোটেও খেয়ালে আসেনি। *রেস্টুরেস্ট কার* প্রায় মানবশূন্য। বেয়ারাগুলো টেবিল সাফ করতে ব্যস্ত। স্টুয়ার্ড আমাদের টেবিলের কাছে ঘোরাফেরা করছে, কখন আমরা উঠবো।

সঙ্গে সঙ্গেই বিল পরিশোধ করে উঠে পড়লাম।

দুজনেই চললাম পেছনে আমাদের বগির দিকে।

রেস্টুরেন্ট কার থেকে বেরুতেই হয়ে গেলাম হতবাক। সেখানে আর কোনো বগি নেই! রেস্টুরেন্ট কারটিই শেষ কার!

স্টুয়ার্ডের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, গত রেলস্টেশনে আমাদের গন্তব্যস্থল ইন্সব্রুকের বগি তিনটি খুলে ইন্সব্রুকগামী একটি ট্রেনের সঙ্গে লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল।

সামনের দিকের বগিগুলো ও রেস্টুরেন্ট কারটি চলছে জার্মানির অন্য এক প্রান্তে। বললাম, আমাদের ব্যাগগুলো সেই বগিগুলোর একটিতে, কি উপায়ে সেগুলো উদ্ধার করবো? আমার অতিরিক্ত ভয়, আমার ব্যাগের মধ্যে আমার পাসপোর্টও ছিল। পাসপোর্ট ছাড়া বিদেশিরা বিদেশে অচল, অক্ষম।

স্টুয়ার্ড কিছু বলতে পারলো না। বললো, পরের স্টেশনে নেমে স্টেশন মাস্টারের পরামর্শ নিন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পরের স্টেশনে ট্রেন থামলো। আমরা নামলাম। তখনো বেশ বরফ পড়ছে। শীতে সাংঘাতিক কাপুনি। আমার ওভারকোটটি আমার ব্যাগের সঙ্গেই রেখে এসেছিলাম। কতো বুদ্ধিহীন!

কিন্তু মেয়েটি বুদ্ধিমতি। মেয়েদের নাকি একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থাকে। সে তার ওভারকোটটি ঠিকই সঙ্গে করে রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়েছিল। বাইরে নেমে সে ওভারকোটটি পরে নিল।

আমার আর কাপুনি সহ্য হয় না। স্টেশন মাস্টারের অফিসটা ছিল বেশ কিছু দূরে। দৌড়াতে শুরু করলাম। শীত কম লাগবে এবং কম সময়ে স্টেশন মাস্টারের অফিসে পৌছে যাবো।

যেই দৌড়াতে শুরু করেছি, মেয়েটি হঠাৎ করে আমার হাত ধরে টানলো।

অবাক বিস্ময়ে দেখলাম, সে ক্ষিপ্রহস্তে তার ওভারকোটটির একটি অংশ আমার গায়ের ওপর বিছিয়ে দিল।

না, না বললাম, প্রথম দিকে জোরেশোরে, পরে আস্তে আস্তে।

সে নাছোড়বান্দা।

অগত্যা আর কি করা যায়! বাধা দিলাম না। ঠাণ্ডার মধ্যেও বেশ গরম বোধ করলাম। তীব্র শীতে বরফের মধ্যে দৌড়ানো যে কতো আনন্দদায়ক তা আমার পরিস্থিতিতে না পড়লে কেউ বুঝতে পারবে না।

এই ধরনের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে প্রথম এবং শেষ।

এখন যদি বরফের মধ্যে কেউ তার ওভারকোটের মধ্যে আশ্রয়ও দেয়, দৌড়াতে পারবো না বয়সের ভারে, হাটুতে বাতের ব্যাথা।

স্টেশন মাস্টার গম্ভীর। আমরা অনুনয়-বিনয় করলাম। টেলিফোন করে পূর্ববর্তী স্টেশন থেকে আমাদের ব্যাগ দুটি নামিয়ে পরবর্তী ট্রেনে এখানে পাঠিয়ে দেয়া হয় অথবা আমরা সেখানে গিয়ে আমাদের ব্যাগ উদ্ধার করি।

স্টেশন মাস্টার বেশ কিছুক্ষণ টেলিফোনে আলাপ করলেন। তার গম্ভীর মুখ হয়ে গেল আরো গম্ভীর। বললেন, সেটি সম্ভব নয় কারণ ট্রেনটি ইতিমধ্যেই আমাদের ব্যাগ ও আমার পাসপোর্টসহ সীমান্ত অতিক্রম করে অস্ট্রিয়ায় ঢুকে গেছে।

মেয়েটির চেয়েও আমার দুর্ভোগ আরো বেশি। পাসপোর্ট ছাড়া আমি অস্ট্রিয়াতে ঢুকতেও পারবো না। উপায়ন্তরবিহীন হয়ে প্রায় বারো ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর আমরা ব্যাগ দুটি পেলাম।

মেয়েটিও যে কারণেই হোক ইচ্ছা করেই আমার সঙ্গে রয়ে গেল।

আমি আর তাকে বললাম না যেতে। যদি সত্যি সত্যিই চলে যায়।

আবার শুরু করলাম আমাদের যাত্রা ইন্সব্রুকের উদ্দেশ্যে।

তবে এবার আর রেস্টুরেন্ট কারে গেলাম না, নিজ ব্যাগ আকড়ে ধরে বসে থাকলাম।

ইন্সব্রুকে নেমে মেয়েটি চলে গেল তার বাড়ির অভিমুখে।

আমি গেলাম আমার হোটেলে।

সন্ধ্যার আগে অপ্রত্যাশিতভাবে এলো মেয়েটির টেলিফোন। সে অনুরোধ করলো তার বাবা-মায়ের সঙ্গে ডিনার খেতে একটি বড় ধরনের হোটেলে।

বাবা-মা কিছু ইংরেজি বলতে পারতেন।

সন্ধ্যাটা খুবই ভালো কাটলো।

সকালে মেয়েটি নিয়ে গেল *স্কি* করার একটা *পিস্ত* বা পাহাড়ে ওপর বরফের ঢালু জায়গায়। জীবনে কখনো স্কি করিনি। যতোবারই চেষ্টা করি ততোবারই পড়ে যাই।

মেয়েটি হাত ধরে আমাকে উঠিয়ে দেয়।

অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থা। লোকে দেখছে, মুখে না হাসলেও মনে মনে হাসছে।

কোচ আমাকে প্রথমে ট্রেনিং নেয়ার উপদেশ দিল।

তিন দিন কোচের সঙ্গে শিক্ষানবিশ হওয়ার পর স্কি পরে বরফের মধ্যে হাটা শুরু করলাম। বেশ মজা।

মেয়েটি সবগুলো দিনই প্রায় সব সময়ে আমার সঙ্গে ছিল। দিনগুলো কেটে গেল খুবই তাড়াতাড়ি। আশাতীতভাবে আনন্দময় হলো আমার ছুটির কয়টা দিন। মেয়েটি পরে আমাকে প্যারিসে চিঠি লিখেছিল ধন্যবাদ দিয়ে এবং ইন্সব্রুকে আবার আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে। প্যারিসে সে আর যাবে না। চিঠিটা লিখেছিল ইংরেজিতে। আমার কয়েকদিনের সান্নিধ্যের ফল স্বরূপ।

আজও অন্য ব্যস্ততায় জার্মান ভাষা শেখা হয়ে ওঠেনি। তবে সে বছরে যে আনন্দঘন অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম তার সূত্রপাত হয় সেই ট্রেন ভ্রমণে।

ঢাকা থেকে

আর্মিমামা

- মোহাম্মদ সুলতান মাহমুদ নয়ন

আমি তখন অনেক ছোট। ক্লাস ফোর কি ফাইভের ছাত্র। আম্মু-আব্বুর সঙ্গে মেহেরপুর নানিদের বাসায় বেড়াতে যাচ্ছিলাম ট্রেনে করে। তখন খুব শীত ছিল। আমরা ট্রেনের যে বগিতে ছিলাম সেই বগিতে কয়েকজন আর্মির লোক ছিল। সেই আর্মি লোকগুলো থেকে একজন আর্মি অফিসার আমার আম্মুকে বোন ডাকেন। সেই কারণে তাকে মামা ডাকি।

মামা আমাকে সারা রাত তার কোলের মধ্যে রেখেছেন এবং যখনই কোনো ফেরিওয়ালা খাবার নিয়ে আসতো, তা কিনে দিতেন। আমার এখনো মনে পড়ে, আমি যখন শীতে কাপছিলাম তিনি তার নিজের কম্বল দিয়ে আমাকে ঢেকে রেখেছিলেন। এতোটা আদার, স্নেহ, ভালোবাসা কোনো মামার কাছ থেকেই পাইনি। জানি না আমার সেই আর্মিমামা এখনো বেচে আছেন কি না।

মামা, আপনি যেখানেই থাকেন, আপনার প্রতি রইলো সালাম ও অশেষ শ্রদ্ধা। আল্লাহ আমার সেই আর্মিমামা যদি বেচে না থাকে তবে তুমি তাকে বেহেশত নসিব করো।

এটাই ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ট্রেন যাত্রা।

রিয়াদ, কেএসএ থেকে

দুই ভদ্রলোক

- মুযাম্মার আল- মিসবাহ

কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে এগারোটার একটা এক্সপ্রেসে ঙ বগির মধ্যবর্তী একটা সিটে গিয়ে বসে পড়লাম। গন্তব্যস্থল দিনাজপুর। একটু তড়িঘড়ি দুজন লোক এসে বিভিন্ন দিকে তাকিয়ে কি যেন খুজতে লাগলো, সম্ভবত তাদের সিট হারিয়ে ফেলেছে।

যাহোক, একটু পর যেন আকাশের চাদ হাতে পেয়েছে এমন একটা ভাব করে আমার সামনের সিট দুটোতে বসলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেন ছাড়লো। আমি আশ্চর্য হয়ে এদিকে তাদের কীর্তি দেখছি। দুজনেই মাঝে মধ্যে কোমল ও যথাসম্ভব অসাধারণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছে এবং ফিশ ফিশ করে সম্ভবত অবজার্ভ করতে শুরু করে দিয়েছে। আমার দিকে তাকিয়ে যেন কিছু বলতে চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না।

এক সময় বলেই ফেললো, কেমন আছেন ভাই।

বললাম, ভালো। আপনাদের...।

থামিয়ে বললো, আমি আশরাফ আযম, ও সিনহা। যাক, আপনার সঙ্গে দেখা হলো তাহলে। আমি খুবই আনন্দিত। সত্যি।

আমি থ।

যাহোক, লোক দুটোর সঙ্গে অনেক কথা হলো। কিন্তু দুই বাক্যের বেশি একটা শব্দও করতে পারলাম না। কারণ লোক দুটো অনবরত কথা বলেই যাচ্ছে। শুনছি না। ভান করছি। কেননা তাদের কথার মাথামুণ্ডু বুঝলাম না। মাঝখানে আমাকে অনেক কিছু কিনে খাওয়ালো। দাম দিতে চাইলে থামালো। তাদের সমাদরের ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন আমি তাদের বস আর তারা আমার কর্মচারী।

এক সময় বললাম, আপনারা আসবেন অবশ্যই আমার ওখানে। সামনের স্টেশনেই নেমে যাবো।

তারা যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললো, মানে আমরা তো আপনার সঙ্গেই যাবো।
বললাম, মানে! ওকে, নো প্রবলেম।
ইয়ে আপনি কি আযম নন?
আযম? কি বলছেন? আযম কে? ও বুঝেছি। দুঃখিত, আমি আযম নই। এ নামের তো পরিচিতও কেউ নেই। তার মানে এই ট্রেনটা চট্টগ্রাম যাবে না।
আমরা যমুনা সেতু পার হয়ে এলাম আর আপনি চট্টগ্রাম খুজছেন কোথায়?
তাদের মাথায় যেন বাজ পড়লো।
পরে জানতে পারলাম, আযমের মানে, তাদের খোজকৃত ব্যক্তির সঙ্গে লোকগুলোর জরুরি একটা লেনদেন আছে। ব্যবসায়িক কাজের জন্য আযমের সঙ্গে দেখা করার একমাত্র পথ হলো এই পথ ধরা। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, তারা আযমকে কখনো দেখেনি। কারণ তিনি এতোদিন বিদেশে ছিলেন।

রামপুরা, ঢাকা থেকে

নিউ ইয়র্ক সাবওয়ে

- স্বপন চক্রবর্তী

নিউ ইয়র্ক সিটির *মেট্রোরেল* যাকে ওরা অর্থাৎ আমেরিকানরা *সাবওয়ে* বলে। সে এক বিশাল কারবার! পৃথিবীর বৃহত্তম সরকারি প্রতিষ্ঠান এমটিএ, MTA (Metropolitan Transportation Authority)–র ব্যবস্থাপনায় এই সাবওয়ে (Subway) সিসটেম চলে। MTA–র ব্যবস্থাপনায় সাবওয়ে ছাড়াও লং আইল্যান্ড রেল সিসটেম এবং মেট্রো নর্থ রেল সিসটেমও রয়েছে। এ লেখায় আপাতত সাবওয়ের কথাই বলবো শুধু।
নিউ ইয়র্ক সিটির বিশাল এলাকা জুড়ে থাকা এই সাবওয়ে সিসটেম যোগাযোগের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান বাহন। প্রতিদিন ত্রিশ লাখেরও অধিক লোকজন এই সিসটেমে যাতায়াত করে। একশ বছর পূর্ণ হলো এই সাবওয়ে তৈরির কাল। এ জন্যে এখন শহর জুড়ে নানান স্টেশনে আয়োজিত হচ্ছে নানান উৎসব MTA এর উদ্যোগে। আর্ট শো, রেল বিষয়ক জাদুঘরের নানান শো, ফ্যাশন শো, এমনকি ব্যান্ড শো পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে শহরের বিভিন্ন স্টেশনে।
বৃহত্তম হলেও আধুনিকতার দিক থেকে নিউ ইয়র্কের সাবওয়ে আমেরিকার অন্যান্য শহর যেমন ওয়াশিংটন, শিকাগো ছাড়া জাপান, ইটালির মেট্রোরেলের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। কিন্তু পৃথিবীতে এটিই একমাত্র সাবওয়ে সিসটেম যার কার্যকারিতা দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই চলমান। একমাত্র যান্ত্রিক ত্রুটি ছাড়া এই সাবওয়ে সিসটেম এক সেকেন্ডের জন্যে বন্ধ হয় না অন্য কোনো কারণে। যান্ত্রিক গোলযোগও হয়তো একটা লাইনে হলেও অন্য লাইনগুলো ঠিকই চলছে।
নিউ ইয়র্ক শহর পাচটি বরো বা এলাকায় বিভক্ত। এটি এখন দেশের প্রায় লোকই জানেন নানান লেখার সূত্রে। এ পাচটি এলাকা জুড়েই এ সাবওয়ে লাইন রয়েছে। আপামর জনগণের প্রধান বাহন এই সাবওয়ের ট্রেনগুলো চিহ্নিত হয় ইংরেজি আদ্যক্ষর দিয়ে বা সংখ্যা দিয়ে। যেমন A, B, C, D, E, F, G, J, N, R, W, Z, S V, Q, L এবং 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ও 9।
এর মধ্যে A ট্রেনটির যাত্রাসীমা হচ্ছে সবচেয়ে দীর্ঘতম। কুইন্স বরোর রকওয়ে (Rockway) থেকে শুরু হয়ে ব্রুকলিন, ম্যানহাটানের ওপর দিয়ে, এর যাত্রা শেষ হয়ে ম্যানহাটানের শীর্ষ এলাকায় দুইশ সাত স্ট্রিটে। এর যাত্রাকাল প্রায় দুই ঘণ্টা।

অন্যান্য ট্রেনগুলোও এভাবে নিউ ইয়র্ক সিটির নানান বরোর সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে চলেছে। এই সাবওয়ে সিসটেমের অধিকাংশই হচ্ছে মাটির নিচে। কিছু কিছু অংশ মাটির ওপরে, অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাটির ওপরে বলতে রোড লেভেল থেকে অনেক উপরে স্থায়ী কাঠামোতে তৈরি রেললাইনের ওপর দিয়েই চলে।

তবে মাটির ওপরে যে ট্রেনগুলো চলে তার অধিকাংশই নিউ ইয়র্কের অন্যতম ও প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রিক গুরুত্বপূর্ণ বরো ম্যানহাটানের বাইরেই চলে অর্থাৎ ম্যানহাটানের ভেতর দিয়ে যাওয়া সাবওয়ের অধিকাংশই মাটির নিচেই চলে। উপরে ও নিচে দুই বিশাল শহর।

সাবওয়েতে প্রবেশের জন্যে ব্যবহার করতে হয় মেট্রকার্ড যা একটি প্লাস্টিকের কার্ড। এতে যাত্রার ভাড়ার অংক বা টাকা ইলেকট্রনিকভাবে দেয়া থাকে। কার্ডগুলো সোয়াইপ (Swipe) করে টার্নস্টাইল (Turnstile)-এর ভেতর দিয়ে স্টেশনে ঢুকতে হয়। যাত্রীদের সুবিধা মতো নানান রকমের কার্ড বিক্রি হয়। সাবওয়ের চারশ সাতষট্টিটি স্টেশনে রয়েছে কার্ড বিক্রির ভেন্ডিং মেশিন কিংবা স্টেশন ক্লার্ক সমন্বিত বুথ।

যাত্রীদের পছন্দ মতো সাপ্তাহিক, মাসিক, দৈনিক কিংবা একশ ডলার সীমা পর্যন্ত যেকোনো অংকের কার্ড নেয়া যায়। একবার প্রবেশের ভাড়া দুই ডলার। একবার প্রবেশ করে নিউ ইয়র্কের যেকোনো জায়গায় যাওয়া যায়। তবে একবার স্টেশন থেকে বেরিয়ে গেলে পুনঃপ্রবেশের জন্যে আবার ভাড়া দিতে হবে। একই ভাড়ায় ট্রেন এবং বাসেও ট্রান্সফার নেয়া যায়। একজনকে হয় তো ট্রেন ধরে আবার বাস ধরে কোথাও যেতে হবে। সেক্ষেত্রে এক ভাড়াতেই সেই যাত্রী যেতে পারবে।

এই সাবওয়ে সিসটেমের অধীনে এখন প্রচুর বাঙালি ও ইনডিয়ান চাকরি করে। স্টেশন বুথগুলোর এজেন্ট (ক্লার্ক) পদে এখন প্রচুর বাঙালি। ট্রেনের কন্ডাক্টর ও ড্রাইভারও বাঙালি রয়েছে। সুপারভাইজার ও অন্যান্য, বিশেষত ইঞ্জিনিয়ার পদে বেশ কয়েকজন বাঙালি আছেন। এছাড়াও সাবওয়ে সংলগ্ন কিংবা অভ্যন্তরস্থ নিউজস্ট্যান্ডগুলোর অধিকাংশই বাঙালি বা ইনডিয়ানদের মালিকানায় রয়েছে। কিছু পদে পাকিস্তানিও আছেন। এখন এই সাবওয়ে সিসটেমের যেকোনো ট্রেনে চড়লেই দুই একজন বাঙালির মুখ দেখতে পাওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। বিশেষত A, E, R, N, V, D, Q, W, 7, 6 ইত্যাদি ট্রেনগুলোতে দিনের যেকোনো সময়েই বাঙালি মুখ দেখতে পাওয়া যায়। বাঙালি তরুণদের কখনো কখনো দলবদ্ধভাবে বাংলায় খোলামেলা গল্প, আড্ডা দিতেও দেখা যায় ট্রেনের বগিতে। অচিন অবোধ্য ভাষায় কথা বলায় রত বা উচ্চস্বরে আড্ডারত বাঙালিদের প্রতি আমেরিকান যাত্রীরা বিরক্তির কটাক্ষ হানলেও এসব তরুণরা তাতে ভ্রূক্ষেপও করেন না দেখা যায়। অবশ্য অকথিত নিয়ম অনুসারে উচ্চ স্বরে ট্রেনের বগিতে কথা বরে অন্যদের বিঘ্ন ঘটানোর মতো আচরণ করা উচিত নয়। এ কথা এসব বাঙালি তরুণরা হয় তো মনেও রাখে না বা জানে না। যদিও বিদেশে দেশের সুনাম রক্ষা সকলেরই পবিত্র কর্তব্য।

যোগাযোগ ও অন্যান্য নানান সুবিধার কারণে অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের মতো এখানে বাংলাদেশিদের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। দিনে দিনে তা বাড়ছেও, বিশেষত নিউ ইয়র্ক শহরে।

সপ্তাহের পাচ দিন অন্তত এ সাবওয়েতেই দুবেলা যাতায়াত করতে হয় আমাকেও। দেখি কতো বিচিত্র দৃশ্য। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সাবওয়ের বিভিন্ন ট্রেনের বগিতে হোমলেস জনগোষ্ঠির বিপুল অবস্থান, বিশেষত শীতের সময়ে। শীতের সময়ে ট্রেনগুলোতে উত্তাপের ব্যবস্থা রয়েছে। তাই বাইরের প্রবল শীতের প্রকোপ থেকে বাচতে ট্রেনে সিট দখল করে বসে থাকে ওরা তল্পিতল্পা নিয়ে। বিকট দুর্গন্ধে পুরো কারেই বসার উপায় থাকে না অনেক সময়।

এর মধ্যে কেউ কেউ মানসিক রোগী। সরকারের নানান এজেন্সিও MTA-র হোমলেস স্কোয়াড (Homeless Squad) দল এদেরকে পুনর্বাসনের নানান চেষ্টা করেও ব্যর্থ। নানান শেল্টারে ওদের নিয়ে গেলে ওরা সেখানে

থাকে না। কেন থাকে না? শেল্টারের জীবন ওদের পছন্দ নয়। কেন নয়? ওখানে বড় বেশি বাধাধরা নিয়ম, তাই।

এ রকমই একজন হোমলেস যার প্রিয় অবস্থানের জায়গা হচ্ছে ট্রেনের বগি কিংবা স্টেশনগুলো। নাম তার স্টিফেন। বাবা ছিলেন আইরিশ, মা জার্মান বংশোদ্ভূত আমেরিকান।

চিনি তাকে অনেককাল ধরে। দেখা এ সাবওয়ের স্টেশনেই। সাহায্য করার সুবাদে নাম জিজ্ঞাসা করে পরিচিতির সূত্র। প্রায়ই তাকে দেখা যায় A ট্রেন কিংবা D ট্রেনে।

ব্রংকস–এর কোথাও সে বড় হয়েছে। নিয়েছে ইউনিভার্সিটির সর্বোচ্চ ডিগ্রি। মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট ছিল তার বিষয়। সর্বনাশা এক প্রেমে সে মন দিয়েছিল স্প্যানিশ মেয়ে এলিজাকে। দুজনে মিলে ম্যানহাটানের অত্যন্ত দামি এক বিল্ডিংয়ের অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে বেধেছিল সুখের সংসার। এর মধ্যে ডাক এসেছিল ভিয়েতনাম যুদ্ধে যাবার। লিভিং টুগেদার করে এক সঙ্গে বসবাসরত গার্ল ফ্রেন্ড এলিজাকে ছেড়ে যেতে মন কিছুতেই চায় না। তবু যেতেই হবে।

এলিজাকে আশ্বাস দিল, সে ফিরে এসেই দুজনে বিয়ে করবে, যেন অপেক্ষা করে ওর জন্যে।

সযতনে সাজানো সুন্দর সংসারে প্রাণের প্রেয়সীকে রেখে স্টিফেন গেল ভিয়েতনাম যুদ্ধে। চিঠি, ফোনে যোগাযোগ হয় নিয়মিত দুজনের। এরপর যুদ্ধের হাঙ্গামায় কিছুদিন যোগাযোগ বন্ধ। মাঝখানে একবার সুযোগ পেয়ে স্টিফেন চেষ্টা করলো এলিজার সঙ্গে যোগাযোগ করতে, পারেনি।

ভীষণ উৎকণ্ঠায় ভুগতে ভুগতে অনেক ধরাধরি করে ফিরে এলো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ছুটি নিয়ে প্রেয়সীর খোজে। অনেক উপহার সামগ্রী কিনে অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে দেখে সেখানে অন্য বাসিন্দা। বিল্ডিং সুপার–এর সঙ্গে কথা বলে জানলো, এলিজা তিন মাস আগে অন্য এক বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে বাসার সমস্ত মালামাল নিয়ে শিকাগো যাবে বলে চলে গেছে।

মাথাটা কেমন করে উঠলো! স্টিফেন বিশ্বাস করলো না সুপারের কথা। ফিরে এসে সেই বিল্ডিংয়ের নিচে দাড়িয়ে অপেক্ষা করে যদি এলিজা আসে। এভাবে দিন যায়, মাসও যায়। এখনো নিউ ইয়র্ক সিটির সাবওয়েতে দিন রাত ট্রেন, স্টেশন এলিজাকে, প্রাণের প্রয়সী এলিজাকে খুজে ফেরে স্টিফেন। এক মনে সিটে বসে বিড় বিড় করে বলে কি যেন। কি বলে সে সারাক্ষণ?

জিজ্ঞাসা করলে বলে, My Favourite Poems to my heart Eliza.

শুনে একান্তে চোখে আসে জল।

এ দেশে ছেলেমেয়েরা এ রকম প্রেমে পড়ে না কখনো। এরা বরং একে অপরকে প্রেমে খেলায়, প্রেমে পড়ে না। দুর্ভাগা স্টিফেন প্রেমে পড়েছে। তাই সে আজ হোমলেস হয়ে সাবওয়েতে ঘুরে বেড়ায়, খুজে তার প্রেয়সীকে।

নিউ ইয়র্ক থেকে

জ্যামবাক

- শাহীন

দিনটি ছিল ১৯৮৫ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহের। আমার এক আন্টিসহ ঢাকা আসার জন্য স্টেশনে আসি। আমার উৎকণ্ঠার শেষ নেই। স্টেশনে একজনকে খুজছি মনে মনে। তার সঙ্গে ফোনে আলাপ করার সময় জানতে পারি ওইদিন তিনিও একই ট্রেনে যাবেন।

ফোনে খোজখবর নেয়ার সময় তিনি জানান, আমার সঙ্গে জরুরি কিছু আলাপ আছে যা আমাকে সামনাসামনি বলতে চান। তখন জানালেন, যদি এক সঙ্গে ট্রেনে যাওয়া যায় তাহলে এতোটা সময়ের মধ্যে এক সময় কথা বলা যাবে।

আমার আন্টি ওনাকে চেনেন না। তবে ওনার সম্বন্ধে আন্টিকে বলেছিলাম।

তখন ট্রেনে নির্ধারণ করা সিট নাম্বার ছিল না। যথাসময়ে ট্রেনে ওঠার পর বসার সুবিধাজনক জায়গা ছিল না। তাই আন্টির সঙ্গে পরিচয় পর্ব শেষ করে সিট যোগাড় করে আমাদের বসার ব্যবস্থা করেন। ওনার নিজে বসার জায়গা হচ্ছিল না। ফলে পরিচিত লোকজন পেয়ে কয়েকজনের সঙ্গে দাড়িয়ে গল্প করছিলেন। কিন্তু নজর ছিল আমার দিকে।

মনে মনে ভাবছিলাম কি এমন কথা থাকতে পারে যা ওনাকে বলতেই হবে।

আমি অবশ্য একটা বিশেষ কারণে ঢাকা যাচ্ছিলাম। দুদিন পরই ফিরে আসতে হবে। তিনি শুধুই আমাদের সঙ্গী হয়েছিলেন আমার সঙ্গে বিশেষ জরুরি কিছু কথা বলার জন্য।

এতোক্ষণ যার কথা লিখছি এ ঘটনার এক মাস আগে থেকে তার সঙ্গে পারিবারিকভাবে আমার বিয়ের প্রস্তাব আসে এবং বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার কথা চলছিল। কিন্তু আমার সঙ্গে তিনি ভালোভাবে এ বিষয়ে কথা বলা ছাড়া সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না এবং তার পরিবারকে, বাবাকে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারছিলেন না।

এর মধ্যে ট্রেন প্রায় দুই ঘণ্টা চলে গেছে। তারপর এক স্টেশন এলে সিট খালি হয় আমাদের সামনের সিটটিই। বসার সুযোগ পান। আমার এক আত্মীয়র সঙ্গেও ওনার পরিচয় ছিল। তাকেও জায়গা করে অন্য স্থানে বসিয়ে আসেন।

এদিকে আমি এক অন্য রকম ভয়, লজ্জার মধ্যে সময় কাটাচ্ছিলাম। এভাবে মা–বাবা ছাড়া আর কখনো যাতায়াত করিনি। আন্টির সঙ্গে বলে মা আমাকে যেতে দেন। আবার আন্টিসহ ফিরে আসবো। ট্রেনের মধ্যে তখনো আন্টিকে বলিনি তিনি কে বা কি কারণে তিনি আমাদের সঙ্গে এসেছেন।

আন্টি বুঝতে পেরেছিলেন, একই জায়গার পরিচিত মানুষ।

ছোটবেলায় ট্রেনে উঠলেই জানালার পাশে আমার বসা চাই। কারণ বাইরের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করা ছাড়াও জানালার দিকে তাকিয়ে থাকলে হঠাৎ করে একটা ল্যাম্প পোস্ট চলে যায়। কতো ল্যাম্প পোস্ট যায় গুণতে গুণতে হাপিয়ে যেতাম। সেদিন ওই সব কিছুই ভালো লাগছিল না। মনেও আসেনি। কেবলই নানান ধরনের চিন্তা ভাবনা মাথায় আসছিল। কিভাবে কথা বলবেন, কি বলবেন, আন্টি শুনে ফেললে কি বলবো ইত্যাদি। এটা মাথায় আসেনি যে, তিনি কারো সামনে কিছু বলবেন না।

কিছু খাবার কিনে এনে আমাদের আপ্যায়নও করলেন।

এরই মধ্যে একটা কষ্টদায়ক ঘটনা ঘটলো। তা হলো, আমরা নিচের সিটে বসা আর মাথার উপরের সিটে রাখা ছিল ওনার একটা ছোট বৃফকেস যা চলন্ত ট্রেনে হঠাৎ করে এসে আমার হাতের ওপর খুব জোরে পড়ে। এতে খুব ব্যথা পাই ডান হাতে। কিন্তু লজ্জায় কিছু বলতে পারি না। চোখ মুখ নরমাল রেখে ব্যথা না পাওয়ার ভান করতে থাকি।

আন্টি হাতে পানির ছিটা দিয়ে দেন।

তাতে কোনো লাভ হয়নি। আমার সামনের সিটে বসে থাকায় তিনি দেখতে পেলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমার ডান হাতটার এক অংশ ফুলে উঠেছে।

তখন তিনি নিজেকে ভীষণভাবে অপরাধী ভাবতে লাগলেন। আমার জন্য খুব মায়া হচ্ছিল কিন্তু কিছুই করতে পারছিলেন না।

ট্রেন চলছে। এর মধ্যে বরফের ব্যবস্থা করা যায়নি।

হঠাৎ ওনার মনে হয় আমাকে আঘাত করা সেই বৃফকেসের মধ্যে ওনার একটা জ্যামবাক (Zambak)–এর কৌটা আছে। তাড়াতাড়ি সেটা বের করে আন্টিকে দেয়।

আন্টি জ্যামবাক মলম আমার হাতে লাগিয়ে মালিশ করতে থাকেন।

ওনার মনটা খারাপ হয়ে যায়।
এভাবে চলতে চলতে এক পর্যায়ে রোমান্টিক পরিবেশের অভাবে ওনার না বলা কথা আর শোনা হয়নি।
আন্টি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে সদ্য পাস করে বের হওয়া বিচক্ষণ বুদ্ধিমতি। ওনার সঙ্গে সব বলি।
তখন চিন্তা ভাবনা করে আন্টি ওনার সঙ্গে সব কথা বলেন। অনেক অজানা বিষয় জেনে নেন।
পৌছানোর পর আমরা বিদায় নিয়ে যে যার গন্তব্যে চলে যাই।
পরে অবশ্য আন্টিই আমাকে ওনার কথা বলার সুযোগ করে দেন ও পাত্রকে ভালো করে যাচাই করে দেখেন এবং আমাকে বলেন, তুমি নিশ্চিন্তে এ মানুষকে বিয়ে করতে পারো। এক কথায় সে একজন জেন্টলম্যান। দেখতেও সুন্দর এবং খুব দায়িত্বশীল বলে মনে হচ্ছে।
আন্টির কথায় আশ্বস্ত হলাম।
দুদিন পর আন্টিই ওনার সঙ্গে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে দেন। এবং ওই মাসেরই তৃতীয় সপ্তাহের তৃতীয় দিনেই এনজেগমেন্টের দিনই বিয়ে হয়ে যায় আমাদের।
আন্টি এ কারণে কয়েকদিন পর আমাদের এনগেজমেন্টের দিন আসেন।
ওই দিন ওনার সঙ্গে ঢাকা থেকে ফিরে আসার সময় ওনার সব কথা শুনি। সেদিনই একজন আন্তরিক, হৃদয়বান, নির্ভরযোগ্য মানুষটিকে আমার মায়ের পছন্দের পাত্র হিসেবে নিজের জীবনের সঙ্গী হিসেবে পাওয়ার কথা আল্লাহর কাছে কামনা করি।
তারপর আজ পর্যন্ত আমরা দুজন প্রায়ই ট্রেনের গল্পটি মনে করি।
সেই জ্যামবাক কয়েক বছর পর নিষিদ্ধ আইটেম হয়ে যায়। তবে এখন ওই জাতীয় গন্ধ পাওয়া যায় *টাইগার বাম, নিক্স* এই ধরনের মলম থেকে। বাসায় তো প্রায়ই এসব ব্যবহার হয়। তখনই আমার স্বামীর সঙ্গে জীবনের প্রথম ট্রেন ভ্রমণের ঘটনাটি মনে পড়ে যায়।

পরিবাগ, ঢাকা থেকে

যাত্রীর অজুহাতে

- রাজু

২০০৩ সালে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে অনার্সে ভর্তি পরীক্ষা দেয়ার সময় সাভার তথা ঢাকায় আমার থাকার তেমন কোনো জায়গা ছিল না।
আমার পরীক্ষা ছিল বেশ কয়েকদিন। তাই প্রতিদিন পরীক্ষা দিয়ে সন্ধ্যাবেলায় কমলাপুর রেলস্টেশনে চলে যেতাম। সেখানে প্ল্যাটফর্মের টিকেট কেটে যাত্রীর অজুহাতে রাত কাটাতাম।
প্ল্যাটফর্মে বসে রাত কাটানো যে কতো কষ্টের, কতো বিরক্তিকর সে সময় আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে।

কুমিল্লা থেকে

জীবনের প্রতীক

- মোনা আহমদ

ভ্রমণ করতে চাইলেই তো ভ্রমণ করা যায় না! বাঙালিরা কূপমন্ডূক। আমি একজন সাধারণ গৃহবধূ। স্বামী সন্তান নিয়ে ঘোরতর সংসারি। কোথাও বেরুতে হলে লোটা-কম্বল না হোক, বিছানা-বেডিং, নিদেনপক্ষে একটা সুটকেস যার মধ্যে চাদর-বালিশ থেকে শুরু করে টাওয়েল, টিফিন ক্যারিয়ার, ফ্লাস্ক না নিলে কেমন

যেন ফাকা মনে হয়। ছুটি হলো তো টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না। সব কিছুর একটা সুষম যোগাযোগ হতে হবে তো!

একবার সত্যি সত্যি একটা অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ হয়েই গেল। একদিন দুপুরে অফিস থেকে ফোন করে তিনি জানালেন, আমাদের চাহিদা মতো টিকিট পাওয়া গেছে। আমরা ইনশাআল্লাহ আগামীকাল সকালে রওনা দেবো।

খুশি হয়ে সুটকেস ও অন্যান্য জিনিস গুছিয়ে তৈরি হলাম। সকালে তো আর সময় পাওয়া যাবে না। পাসপোর্ট আগেই তৈরি করা ছিল।

অবশেষে স্বামীর সঙ্গে প্লেনে কলকাতা পৌছালাম। *কলকা মেল*-এ কলকাতা থেকে ট্রেন জার্নিটা একটু লম্বা হবে। তা হোক, দিল্লি, আগ্রা, আজমির শরিফ, লালকেল্লা ছোটবেলার পড়া ইতিহাস চোখের সামনে সব জীবন্ত হয়ে উঠবে। তাজমহল নামটার মধ্যেই কেমন যেন মোহ আছে। চাদনি রাতে তাজমহল দেখার প্রোগ্রাম আছে। এসব বিবেচনা করেই টিকেট করা হয়েছে।

আনন্দের সঙ্গে ট্রেনে উঠলাম। ক্যাবিনের দরজায় দাড়িয়ে যাত্রীদের ওঠানামা দেখছি। বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন বেশ। খুব ভালো লাগছে।

ট্রেন ছাড়লে আমরা একটু গুছিয়ে নিয়ে চায়ের অর্ডার দিলাম। তাশ, দাবা, সবই সঙ্গে আছে। সময় কাটানো আমাদের কাছে কোনো প্রবলেম নয়। আমরা দুজনে দুজনের পরিপূরক। যারা একা ভ্রমণে অভ্যস্ত তাদের কথা অবশ্য আলাদা। মূলত ভ্রমণ সঙ্গীর ওপর নির্ভর করে ভ্রমণের আনন্দ। ভ্রমণকারীকে হতে হয় সর্বভুক আবার গুণবিচারি। পরমহংসের মতো পানি থেকে দুধটা আলাদা করে খেতে পারতে হয়।

চা আসার আগে ভাবলাম একবার টয়লেটটা হয়েই আসি। এরপর ভিড় হয়ে যাবে। দরজা দিয়ে বেরিয়ে করিডোর দিয়ে এগিয়ে বাম দিকে টয়লেট।

ট্রেনের ঝাকুনিতে ব্যালান্স ঠিক রাখতে পারছিলাম না। কাজ সেরে তাড়াতাড়ি ক্যাবিনে এসে ঝুপ করে বসে পড়লাম। পাশে তাকিয়ে দেখি দুটি শিখ যুবক আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। ভাবলাম সহযাত্রী, এক সঙ্গে অনেকক্ষণ কাটাতে হবে, সদ্ভাব রাখার মানসে আমিও তাদের দিকে হেসে তাকালাম।

সামনের উপরের বার্থে এতোক্ষণ যে যুবকটি বিছানা করছিল সে ধুপ করে লাফ দিয়ে নিচে নামলো। ইংরেজিতে আমায় জিজ্ঞাসা করলো, আর ইউ ফ্রম কলকাতা?

হেসে মাথা নাড়ালাম। বললাম, নো, ফ্রম বাংলাদেশ। আই হ্যাভ কাম টু ভিজিট ইয়োর কান্ট্রি।

ওরা খুব খুশি হয়ে আমার সঙ্গে আলাপ শুরু করে দিল। কোথায় কোথায় গেলে আমাদের খুব ভালো লাগবে। পর্যটন কম্পানির কোনোটার সঙ্গে ঘুরলে আমরা অনেক দর্শনীয় জায়গা কভার করতে পারবো ইত্যাদি।

মাত্র পনেরো দিন থাকবো শুনে এক যুবক বললো, ওহ! টু শর্ট এ টাইম টু ভিজিট ইনডিয়া। আরো বললো, আমি যদি চাই তবে ওরা আমাকে ওদের গ্রামের বাড়ি বেড়াতে নিয়ে যাতে পারে।

হেসে বললাম, তা কি করে হবে! তোমাদের তো অন্য প্রোগ্রাম।

ওই শুনে আরেক যুবক বলে উঠলো, সো হোয়াট, আমাদেরই তো দেশ! আমরা পরে আবার প্রোগ্রাম করবো। তোমাকে তো আমরা আর পাচ্ছি না।

এরা ক্যাডেট কলেজের ছাত্র। চার বন্ধু ছুটিতে বেড়াতে বের হয়েছে।

টগবগে তারুণ্যের উচ্ছ্বাস। শিখ ধর্মের কারো সঙ্গে এর আগে আমার আলাপচারিতা হয়নি। ওদের সৌজন্য বোধ, অমায়িক শিষ্টাচার আমাকে মুগ্ধ করলো। আমার খুব ভালো লাগছে। তারুণ্যের ধর্মই এই। আশপাশে

সবাইকে মাতিয়ে রাখে যেন বলে, হে অতীত, তোমরা কিছুই হারাওনি। আমাদের মধ্যেই তোমরা বেচে আছো এবং থাকবো।

এর মধ্যে একজন আমায় জিজ্ঞাসা করলো, আমি কি পছন্দ করবো, চা না কফি?

চায়ের কথায় হঠাৎ আমার মনে পড়লো, আরে, অনেকক্ষণ থেকে আমার স্বামীকে দেখছি না! গেল কোথায়?

কথাটা মনে হতেই অবাক হয়ে খেয়াল করলাম এটা একটা চার বার্থের ক্যাবিন, আমাদেরটা ছিল দুই বার্থ। বিদেশে, ট্রেনে, কলকা মেল।

মুহূর্তের মধ্যে বুঝে ফেললাম ভুল ক্যাবিনে বসে আছি। নিজের ক্যাবিন মনে করে নিঃশঙ্কচিত্তে ওদের সঙ্গে আলাপ করছিলাম। কেমন করে যেন বুঝে ফেললাম ওরা আমার ভুল ঠিকই ধরতে পেরেছে। আমি ভুল করে আর ওরা জেনেশুনে এই পুরো সময়টা আমরা এক সঙ্গে উপভোগ করেছি।

তাই বলে হেরে যাবো কেন? আমি বঙ্গললনা।

যেন কিছুই হয়নি, এইভাবে উঠে দাড়ালাম, উইথ অল মাই গ্রেইস অ্যান্ড ডিগনিটি।

আমাকে এতো সময় দেয়ার জন্য এবং চায়ের জন্য ধন্যবাদ জানালাম। এবং শেষে বললাম, তোমাদের সঙ্গে গল্প করে আমার খুব ভালো লেগেছে। তোমরা আমাকে আমার ছেলেদের কথা মনে করিয়ে দিয়েছো। আমার বড় ছেলে আর্মিতে আর ছোট ছেলে কলেজে পড়ছে। তাদের খুব ভালোবাসি এবং তাদের খুব মিস করছি। আবার ধন্যবাদ জানিয়ে ওদের অবাক দৃষ্টির সামনে দিয়ে আমার স্বামীর ক্যাবিনে ফিরে এলাম।

স্বামী বললেন, এতো দেরি হলো যে? তোমার চা তো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

আরাম করে বসে তাশ শাফল দিতে দিতে হেসে বললাম, পাশের ক্যাবিনে বসে গল্প করছিলাম।

ট্রেন থেকে নামার সময় দেখি একটু দূরে এক লাইনে চারটি শিখ শিরস্ত্রান দেখা যাচ্ছে। আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য অপেক্ষা করছে। কাছে এসে ওদের দিকে তাকাতেই ওরা ওদের দেশি কায়দায় চারজন এক সঙ্গে আমাকে অভিবাদন জানালো।

আমিও হাসিমুখে হাত নেড়ে ওদের অভিবাদন গ্রহণ করলাম।

সর্বকালে, সর্বদেশে, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে তরুণ সমাজ জীবনের প্রতীক। ওরা আমার জীবনে অবিস্মরণীয় হয়ে রইলো।

গ্রীন রোড, ঢাকা থেকে

জুতা ও টিকেট

- শাহাবুদ্দিন

পারাবত এক্সপ্রেস–এ ঢাকা যাচ্ছিলাম। সহযাত্রী বুলবুলভাই। বুলবুলভাই পত্রিকা পড়ছিলেন। ট্রেন ভ্রমণ করতে ভালোই লাগে। কারণ যখন ইচ্ছা হাটা যায়। আবার খাবারেরও ব্যবস্থা আছে।

আমরা ট্রেনের যে বগিতে ছিলাম, ট্রেনের টিটি টিকেট চেক করার জন্য আমাদের কাছে এলেন। আমাদের টিকেট দেখলেন। যখন আমাদের পাশের যাত্রির টিকেট দেখতে চাইলেন তখনই ঘটলো বিপত্তি। নিচে তাদের কথোপকথন দেয়া হলো –

টিটি : এক্সকিউজ মি, আপনার টিকেট দেখান।

যাত্রী : জুতা খুলতে হবে।

টিটি : আমি তো টিকেট চেয়েছি, জুতা নয়।

যাত্রী : এ জন্যই তো জুতা খুলতে হবে।

টিটি : ফাজলামি করেন কেন, টিকেট দেখান।

যাত্রী : ফাজলামি নয়, জুতা খুলতেই হবে।

টিটি : পুলিশ ডাকবো, পুলিশ, পুলিশ...।

টিটি ও যাত্রীর চেচামেটিতে আমি এবং অন্যসব যাত্রী জড়ো হলাম। আমরা জানতে চাইলাম, ব্যাপার কি? তখন যাত্রী বললেন, ট্রেনে প্রায়ই পকেটমার হয়। কিছুদিন আগে ট্রেনে পকেটমার আমার সব কিছু নিয়ে গেছে। তাই এখন থেকে যাতায়াতের সময় মোজার ভেতরে টাকা রাখি, তারপর শু পরি। এবং টাকার সঙ্গে ট্রেনের টিকেটটাও রেখেছি। তাই বলেছি, আমাকে জুতা খুলতে হবে।

গোপলাবাজার, হবিগঞ্জ থেকে

বাজি

- মোহাম্মদ মুইনুল ইসলাম

আমাদের বাড়ির প্রতিবন্ধী ছেলে বাবু। শিশুদের মতো ট্রেনকে বলে *লেল গালি*। বাড়ির কাজের লোকটি বলে *রেলগাড়ি*। আর তার ছেলে বলে *টেরেন*।

এই ট্রেনের সঙ্গে আমার পরিচয় সেই ছোটবেলা থেকেই। ডাকাতিয়া নদীর পাড়ের ফরিদগঞ্জ থানার রূপসা গ্রাম থেকে যখন বারো চোদ্দ মাইল দূরে চাদপুর শহরে যেতাম আব্বা-আম্মার সঙ্গে তখন অদ্ভুত চোখে দেখতাম ট্রেন চলাচল, কান পেতে শুনতাম ট্রেনের আওয়াজ। ডাক শুনলেই দৌড়ে মেজখালার বাসার দরজার কাছে চলে যেতাম। চাদপুরে কালিবাড়ি স্টেশন ও বড় স্টেশনে চলে যেতাম ট্রেন দেখার জন্য।

আমার বড়আপা চট্টগ্রাম থাকেন। একবার ঈদের ছুটিতে বড়আপাকে নিয়ে চাদপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি। *আন্তঃনগর মেঘনা* ট্রেনে বিকেলবেলা রওনা দিয়েছি। আমি, বড়আপা, তার স্কুল পড়ুয়া দুই ছেলে, কাজের মেয়ে ও আপার ননদের মেয়ে। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। লাফঝাপ করে ট্রেনে উঠেই দেখি আমাদের চার সিট সামনাসামনি তো হয়নিই, বরং এক বেঞ্চ দূরে গিয়ে অন্য দুই সিট। বড়আপা, তার ননদের মেয়ে ও কাজের মেয়েকে একত্রে বসিয়ে দিলাম দুই সিটে। সামনের দুই সিটে বসা লোকদেরকে দেখে ভয়ই লাগলো। বিশাল দেহ। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও তারা আমার অন্য দুই সিটের সঙ্গে স্থান বদলালো না। উল্টো জ্ঞান দিল, *অবা হলেরে এক পাল্লাত ন মাপিও*।

অগত্যা দুই ভাগিনাকে নিয়ে দূরে গিয়ে বসলাম।

শাই শাই করে ছুটে চলছে ট্রেন। পাহাড় কেটে গাছপালার ফাক গলে বেরিয়ে যাচ্ছে। গুণবতী স্টেশন পার হয়ে আমরা আরো অনেক দূর চলে এসেছি। ট্রেনের জানালা খোলা। সুন্দর বাতাস ও মনোরম দৃশ্য। হঠাৎ ট্রেনের কামরায় একটা হই চই পড়ে গেল। আমার মনে হলো আমার গায়ে কে যেন ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিয়েছে।

সংবিৎ ফিরে পেয়ে গালে হাত দিয়ে দেখি একগাদা গোবর লেপ্টে আছে গালে। দ্রুত পরিষ্কার করে দেখি ভাগ্নেদের গায়েও আছে। সেগুলো পরিষ্কার করে পেছনে তাকিয়ে দেখি সবার বেহাল অবস্থা। সবার গায়ে গোবর ভর্তি। অর্থাৎ ডান দিকের জানালার পাশে বসা প্রায় সকলের গায়েই এ দৃশ্য। সামনের সিটে বসা সেই বিশালদেহী ভদ্রলোকদের অবস্থা আরো করুণ। হাত, মুখ, গলা, জামা প্রায় সবই ভরে গেছে।

ভাগ্নে বললো, মামা, গোবর খেতে তিতা লাগে।

কিভাবে বুঝলে?

আমার মুখে একটুখানি গোবর চলে গেছে।

ট্রেন চলছে। সবাই মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গেছে। বিশালদেহী লোকগুলোর কাছে জানতে পারলাম দুটি বদমায়েশ ছেলে দুই বালতি গোবর চলন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে ছুড়ে মেরে পালিয়ে গেছে। ফলে এই বিপত্তি। সে তো গেল বিব্রতকর স্মৃতি।

একবার চাদপুর থেকে চট্টগ্রাম যাচ্ছি। এক্সট্রা বগিতেও দুই সিটে তিন চারজন করে বসতে হয়েছে। আমার পাশে প্রায় আমার বয়সী স্মার্ট একটি মেয়ে। সঙ্গে তিন চার বছরের একটি ছেলে ও মেয়েটির বৃদ্ধ বাবা। আলাপচারিতায় বুঝলাম মেয়েটি অসুখী। স্বামী চাকরি করেন চট্টগ্রাম, তিনি আসেননি।

আমরা এক বেঞ্চে চারজন বসেছি। এ কথা–ও কথা বলে মেয়েটির সঙ্গে বেশ জমিয়ে ফেলেছি।

মেয়েটি তার ছেলেকে বললো, এ যে তোমার মুইন আংকল, তোমার সিফাত আংকল–এর মতো, তাই না?

সে আর আমি আজনবী। এ রকম তরুণ বয়সে একটা তরুণী মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব কার না ভালো লাগে বলুন? ট্রেনের ঝাকুনির কারণে পুরো কাপ চা কখনোই খেতে পারিনি। আমি চিপস কিনি, সে চানাচুর কেনে ইত্যাদি। মেয়েটি তার ঠিকানা দেয়, তার বাসায় নিমন্ত্রণও করে।

চট্টগ্রাম পৌছায় রাত নয়টায়। রেললাইন থেকে প্ল্যাটফর্ম অনেক উচুতে। ট্রেন থেকে নেমে আমি লাফ দিয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠে গেলেও মেয়েটি উঠতে পারছিল না। ফলে সে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়।

আমি সংকোচ বোধ করি। তার হাত ধরে টেনে উপরে ওঠাই। আমার ভেতরে এক ধরনের ভালো লাগা অনুভূতি খেলে যায়। মেয়েটির আগ্রহ থাকলেও বিবেকের তাড়নায় পরকীয়া হতে দিইনি। সেখানেই ইতি। বন্ধুদের সঙ্গে সে গল্প করেছি টানা প্রায় ছয় মাস।

বর্তমানে কাজের জন্য এমন এক জায়গায় পোস্টিং যেখানে পানি ছাড়া আর কিছুই দেখি না। সেদিন এক কলিগকে বললাম, বাংলাদেশের এমন একটি বিভাগের নাম বলুন যা দেশের একমাত্র বিভাগ যেখানে গ্যাস এবং ট্রেন দুটোর একটিও নেই।

তিনি বললেন, অসম্ভব! এমন বিভাগ বাংলাদেশে নেই।

আছে। এই যে বরিশাল।

তিনি বললেন, আপনি বদলি হয়ে নতুন এসেছেন এই বিভাগে, তাই কিছু জানেন না। এখানে গ্যাস ও ট্রেন দুটোই আছে।

আমি শতভাগ নিশ্চিত যে নেই।

তিনি বললেন, আছে।

কথায় কথায় একশ টাকা বাজি হয়ে গেল। রাজি হলাম।

তিনি প্রথমে আমাকে তার বাসায় নিয়ে দেখালেন এই যে গ্যাস, হোক সিলিন্ডারে, গ্যাস তো?

হ্যা। বলতে বাধ্য হলাম।

এরপর তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন বরিশাল ভিলেজ পার্কের পাশে অবস্থিত শিশু পার্কে। দেখিয়ে বললেন, ওই যে দেখুন রেলগাড়ি।

সত্যিই তো!

আমি হা হয়ে গেলাম। শ শ ছেলেমেয়ে ট্রেনে চড়ে শিশু পার্কের ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কলিগ শাহ আলমভাই বাজিতে জিতে আমার হাত থেকে একশ টাকা নিয়ে বললেন, চলুন ওই রেললাইনের পাশে বসেই ফুচকা খাই।

বললাম, চলুন।

বরিশাল থেকে

এ যুগের লাইলি মজনু

- মোহাম্মদ ওয়ালিদ পাশা নাহিদ

প্রায় দশ বছর আগের ঘটনা। ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাচ্ছিলাম ট্রেনে। পথিমধ্যে হঠাৎ করে এক জোড়া যুবক-যুবতী ট্রেনের নিচে ঝাপিয়ে পড়ে আত্মাহুতি দেয়।

পরের দিন পত্রিকা মারফত জানতে পেরেছিলাম উক্ত যুবক-যুবতী নিজেদের ইচ্ছা মতো বিয়ে করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু তাদের অভিভাবকরা তাদের এ সম্পর্ক মেনে নেয়নি বরং তাদের বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল।

বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল। কিন্তু অভিভাবকরা যদি তাদের সম্পর্ক মেনে নিতো তাহলে এভাবে দুটি পবিত্র মানুষের মৃত্যু হতো না। মারা যাবার পর দুপক্ষের অভিভাবকরা পাগলপ্রায় হয়েছিল।

এ ঘটনা থেকে অভিভাবকদের সদয় হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি, সেই সঙ্গে যুবক-যুবতী ভাই-বোনদের এ রকম সম্পর্ক স্থাপন থেকে বিরত থাকারও আহ্বান জানাচ্ছি।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

ইঞ্জিন প্রেমী

১৯৮৩ সাল। সিলেটের ছোট্ট একটা স্কুলে তখন থৃ-তে পড়ি। বাবা-মায়ের কাছে আবদার ছিল একটা খেলনা ট্রেনের। তারা বললেন, দেয়া হবে যদি এবারের পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে পারি। তা ফার্স্ট হওয়া সে বছর হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সে জন্য বিন্দুমাত্র ক্ষোভ না থাকলেও ট্রেনটা না পাবার আক্ষেপ বহুদিন ছিল। মনে পড়ে, কাগজ কেটে টেপ দিয়ে জোড়া লাগিয়ে একটা ট্রেন বানিয়েছিলাম। সেটা নিজে চলতো না বলে নিজেকে ঠিক প্রবোধ দিতে পারিনি।

১৯৯৬ সাল। তখন ঢাকায়। কমলাপুর স্টেশনের অনেক লোকোমাস্টার এবং ইঞ্জিন পার্সনদের কাছে আমি একটা পরিচিত মুখ। তারা আমাকে দেখাতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তাদের নিয়ে আসা ইঞ্জিনগুলোর প্রত্যেকটা নাট বোল্ট কি করে সেটা বোঝার চেষ্টা করতে। প্রায়ই তারা তাদের মূল্যবান সময়ের কিছুটা ব্যয় করতেন আমার কৌতূহল মেটাতে।

এইচএসসি পরীক্ষার পর বেড়াতে যাবো ঢাকার বাইরে। অবশ্যই ট্রেনে। কোনো কিছু না ভেবে সময়ের আড়াই ঘণ্টা আগে পৌছে গেলাম প্ল্যাটফর্মে, উদ্দেশ্য একই। পরিচিত একজন লোকোমাস্টারকে ডেকে জেনে নিলাম কোন ইঞ্জিন নিয়ে যাবে আমার ট্রেনটাকে এবং কে চালাবেন। বাংলাদেশ রেলওয়ের ২৭০০ সিরিজ এবিবি হেনশেল ইঞ্জিনগুলো সে বছর নতুন এসেছে জার্মানি থেকে। তাদেরই একটা বিআর ২৭০৮ চলবে আজ। আর যিনি চালাবেন তিনি ভালোই পরিচিত। ধৈর্যশীল এই মানুষটি আমার বহু জটিল প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন তার স্বভাবসুলভ হাসিমুখে। লোকোশেডে গিয়ে ২৭০৮-এর সামনেই তাকে পেলাম। ইঞ্জিন ক্যাবে উঠেই প্রশ্ন, স্টার্ট করেন কিভাবে?

ইগনিশন সুইচগুলো দেখিয়ে দিয়ে স্টার্ট করতে বললেন।

করলাম। ওয়ার্মআপ শুরু হতেই যেন ঘাড়ের ঠিক পেছনে গর্জে উঠলো। আট সিলিন্ডার ১৫০০ হর্স পাওয়ারের ইএমডি প্রাইম মুভার।

ব্রেক রিলিজ করে রিভার্সার সামনের দিকে দিয়ে যখন তিনি থ্রটলটা দেখিয়ে বললেন, এই ইঞ্জিনকে নিয়ে চলেন ট্রেনের কাছে।

কয়েক মুহূর্ত তাকিয়েছিলাম তার দিকে। আজও চোখ বন্ধ করলে দেখতে পাই কাপা হাতে আমি থ্রটল টানছি আর ২৭০৮ চলছে ট্রেনের দিকে। সেই কাপা হাত আর প্রথম প্রেমের প্রথম স্পর্শের কাপা হাতের তুলনার বিতর্কে নাইবা গেলাম।

সেদিন ২৭০৮-কে ট্রেনের কাছে নিয়ে লোকোমাস্টারকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। অনভিজ্ঞ হাতে পেছনের সাড়ে সাতশ যাত্রীর দায় নিয়ে পুরো ট্রেন চালানোর ইচ্ছা বা সাহস কোনোটাই ছিল না।

২০০০ সাল। মার্কের সঙ্গে পরিচয় একটা মডেল ট্রেন ক্লাব থেকে। ১৯৯৬-এর শেষ থেকে প্রবাসী হয়েছি এই টেক্সাস-এ। মডেল ট্রেন ক্লাবগুলো কয়েকটা বিভিন্ন ধরনের মডেল রেললাইন বানিয়ে রাখে যার ওপর মেম্বাররা নিজেদের ট্রেন চালাতে পারে।

স্বল্পভাষী এই আধা ইটালিয়ান আধা আমেরিকান যুবক তখন বিএনএসএফ রেল-এ ইঞ্জিনপার্সন হিসেবে কাজ করতেন। কথা প্রসঙ্গে তাকে বলেছিলাম বিআর ২৭০৮ চালানোর কথা।

একদিন সবে ইউনিভার্সিটি থেকে বাসায় ফিরেছি। একটু পর চাকরিতে যেতে হবে। এমন সময় তার ফোন।

টানভিড়, একটা গাড়িবাহী ট্রেন আরলিংটন জেনারেল মোটর্স প্লান্ট থেকে ফোর্ট ওয়ার্থ-এ নিয়ে যাচ্ছি। চালাতে চাও?

এমন সুযোগ ছাড়বো, প্রশ্নই আসে না। চাকরিতে কল করে দেয়া হলো, বাসায় ইমার্জেন্সি, আসতে পারবো না। জানিয়েই ছুটলাম জিএম প্লান্টে। গাড়িবাহী ট্রেনগুলো বেশ ভারী বলে এদেরকে দুই থেকে পাচটা ইঞ্জিনও দেয়া হয়। মার্ক-এর ট্রেনে ছিল তিনটা। একটা ৪৩০০ হর্স পাওয়ারের এসডি ৯০ ম্যাক আর বাকি দুটো ২৫০০ হর্স পাওয়ারের জিপি ৩৫। জিএম-এর লোকজনের চোখ এড়িয়ে (এখানকার রেল আইন বেশ কড়া, মার্ক আগেই বলেছিলেন কিছুটা কৌতুকের স্বরে, যদি প্লান্টের কারো সামনে পড়ে যাও তবে আমার চাকরি যাবে) ইঞ্জিন ক্যাবে সেদিন থ্রটল ধরেছিলাম। এতোটুকু হাত কাপেনি সেদিন ৯০০০ ঘোড়া চালাতে। তবে বুঝেছিলাম শক্তিশালী মেশিন কিভাবে মানুষকে নিজের চেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী করে দেয়।

২০০৫ সাল। জীবনের প্রয়োজনে আজ তথ্য তাড়িয়ে বেড়াই আলো আর তামার ওপর দিয়ে। মাঝে মধ্যে নিজেকেও মনে হয় একটা ইঞ্জিন। এক রেলে মূল্যবোধ, আরেক রেলে শুধুই চাওয়া, এ দুয়ের ওপর দিয়ে ছুটে চলছি ভবিষ্যতের দিকে। এরই মাঝে সৌভাগ্য হয়েছে বেশ কিছু ট্রেনে চড়ার। বাড়ির পাশের ১৯৪০ আমলের টুরিস্ট স্টিম ট্রেন *ট্যারেনটুলা এক্সপ্রেস,* নিউ ইয়র্ক *সাবওয়ে,* লন্ডনের *টিউব,* ডালাসের *ডার্ট,* মেলবোর্নের *সিটি ট্রানজিট,* অ্যামট্রাক *টেক্সাস ঈগল* এবং ঘণ্টায় ১৫০ মাইল স্পিডের (২৪০ কিলোমিটার ঘণ্টায়) অ্যামট্রাক অ্যাসেলা তাদের কয়েকটা। চালানোর সুযোগ হয়েছে আরেক ৪৪০০ ঘোড়ার ইঞ্জিন জেনারেল ইলেকট্রিক এসি ৪৪০০ এবং মেলবোর্নের ছোট্ট টুরিস্ট ট্রেন পাফিং বিলির ইঞ্জিন ৭-কে।

ফ্রান্সের টিজিভি চড়ার পরিকল্পনা রয়েছে সামনে।

তবু আজ পর্যন্ত দেশের আন্তঃনগর ট্রেনের খোলা জানালা দিয়ে দেখা বৈচিত্র আর কোথাও পাইনি।

সেই না পাওয়া খেলনা ট্রেন... আজ যখন রেললাইন বিছিয়ে এইচ ও স্কেলের (১:৮৭) মডেল ট্রেনগুলো চালাতে বসি তখন ঠিক ফিরে পাই ১৯৮৩-র সেই আমাকে।

নাম বিহীন, টেক্সাস থেকে

atanveer@Concentric.net

শাটল সঙ্গীত

- নুরু

আমার বাড়ির পাশ দিয়ে রেললাইন চলে গেছে। সাত কিলোমিটার যাবার পর দোহাজারি পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে এ লাইন। এ দোহাজারি স্টেশন বাংলাদেশের দক্ষিণের শেষ স্টেশন।

ছোটবেলায় রাতে যখন ভূতের ভয়ে আড়ষ্ট থাকতাম তখন ট্রেনের হুইসাল শুনলে বুকের ভেতর সাহস ফিরে আসতো। সবাই বলতো, কোনো মতে দুই লাইনের মাঝখানে চলে আসতে পারলে ভূতের বাপও কিছু করতে পারবে না। তাই ট্রেন আমাদের ছোটবেলায় ছিল পরম আত্মীয়ের মতো।

যখন মালগাড়ি যেতো তখন ট্রেনের গতি কম থাকতো। আমরা প্রায়ই দৌড়ে উঠতাম এবং কিছু দূরে গিয়ে নেমে পড়তাম। তখন মনে এতো আনন্দ হতো, এখন ভলভো গাড়িতে চড়েও এতো মজা পাই না।

স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার অপেক্ষায় থাকতাম। শেষ হলেই সৈয়দাবাদে খালার বাড়ি যেতাম ট্রেনে করে।

ট্রেনে উঠলেই দেখতাম আশপাশের সব কিছু কতো দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে। কোনো স্টেশনে থামার পর পুরোপুরি থামার আগে ছোট একটা টান দেয়। এ টান এতো মজার ছিল!

এসএসসি-র পর এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলাম। যার সঙ্গে আমার স্কুল থেকে স্বপ্ন দেখাদেখি তার কোনো খবর পাচ্ছিলাম না। ভেতরে গুমরে মরতে থাকি। কোনো ব্যাখ্যায় এ পরিণতি বিশ্লেষণ করতে পারি না। ভাবলাম সবশেষ।

অবসরে হাইথট বই-টই পড়ে পেকে গিয়ে থাকতে পারি।

একদিন দোহাজারিতে গেলাম এই দীর্ঘ রেললাইন কেমন করে শেষ হলো তা দেখার জন্য। ট্রেন থেকে নেমে লাইন ধরে সামনে হেটে গেলাম। দেখলাম লাইনটা একটু গিয়ে শঙ্খ খালের পাড়ে এক ঘন জঙ্গলে কেমনভাবে যেন হারিয়ে গেছে।

সে বয়সে ভেবে নিলাম, জীবনের সব কিছু বোধহয় এমন। কোনো কিছুরই গোছালো শেষ হয় না। যেন হুট করে যেনতেনভাবে সমাপ্তি হয়ে যায়। এখন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হতে সে সময়ের অনুভূতির সত্যতা বুঝতে পারি খুব।

চবি শাটল ট্রেনের কথা শুনতে শুনতে তা দেখার এবং তাতে চড়ার চরম লোভ জেগে উঠে সিটি কলেজে পড়ার সময়। শুনতাম সেখানে দরজায় জোড়া জোড়া ছাত্রছাত্রীরা বসে থাকে। ছেলেমেয়েরা একজনের গা ঘেষে অন্যজন দাড়িয়ে থাকে। ছাত্রছাত্রীরা গলা ছেড়ে কোরাসে গান গায়।

এইচএসসি-র পর ভর্তি পরীক্ষা দিতে গিয়ে ষোল শহর থেকে শাটল ট্রেনে উঠলাম। প্রথমে দেখেই হতাশ হলাম। এ আর এমন বিশেষ কি?

উঠলাম ট্রেনে অনেক কষ্টে। ভেতরে তিল ধরনের জায়গা নেই। ঘামে গরমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। ভেতরে যতো বেশি গরম ট্রেনের গতি ততো বেশি কম। গুই সাপের মতো কেমন যেন ধীর।

বিরক্তিতে এক চোট গাল দিলাম ইউনিভার্সিটি স্টেশনে নেমে। ভাবলাম এ শাটল নিয়ে যারা মহিমা ছড়ায় তারা পাগল ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু শাটল ট্রেনের মহিমা টের পেলাম ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির পর। এ ট্রেন যেন এ ইউনিভার্সিটির প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর আত্মার পরম আত্মীয়। হতে পারে এ ট্রেন ভাঙাচোরা, এ ট্রেন গুই সাপের মতো ধীর। হতে পারে এ ট্রেন মাঝে মধ্যে লাইন ছেড়ে বেলাইনে চলে। যারা চবি থেকে পাস করে এখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছেন তারা অবশ্যই এ ট্রেনের স্মৃতি স্মরণ করে এখনো দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। এ ট্রেন এমনই আবেগের।

প্রতিটি বগিতে গ্রুপগুলো কোরাসে গান গায়। আমি হলফ করে বলতে পারি, এ গান বাচ্চু, জেমসের কোয়ালিটির সমান। কতো চমৎকার গান গায় War gods, খাইট্টা খা, Cu Virus এবং অন্যরা। শত প্রেমিক–প্রেমিকার বিচ্ছেদের সাক্ষী এ ট্রেন। হয়তো এ ট্রেনেই একদিন চোখাচোখি, তারপর কপোত–কপোতী হয়ে দরজায় বসা, বাদাম ছিলে খাওয়া, খুনসুটি মারা এবং একদিন একা হয়ে জানালার পাশে বসে বিচ্ছেদের গান শোনা। প্রতিটি বগি থেকে বগি চাপড়ানোর ড্রুম ড্রুম শব্দ আসবেই।

সেদিনের কথা ভুলবো না। সেকেন্ড ইয়ারের শেষ পরীক্ষা দিয়ে সাড়ে পাচটার ট্রেনে এসে বসলাম। ছাত্রছাত্রী খুব বেশি নেই। বাইরে একটু একটু শীতল হাওয়া। ট্রেন চলা আরম্ভ করলো।

বাইরে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। জানালার পাশে বসে উদাস হয়ে ভাবছি নিজের জীবনের কথা, কতো স্মৃতি! সব আজ বুকের ভেতর জমাট হয়ে কষ্ট ছড়ায়। মাঝে মধ্যে গভীর নিঃশ্বাস ফেলছি বগির ভেতরে অন্ধকার। এ সময় সায়েন্স ফ্যাকাল্টির এক বড়ভাই দরাজ গলায় গেয়ে উঠলেন –

আমার গায়ে যতো দুঃখ সয়

বন্ধুয়ারে কর তোমার মনে যাহা লয়।

অনেক কষ্টে চেপে রাখতে চেয়েও চোখের জল আর আটকাতে পারলাম না। ট্রেনের দুলুনিতে থমকে থমকে ভীষণ কান্না এসে পুরো আমাকে গ্রাস করে নিল। প্রিয় শাটলের দুলুনিতে আমার কান্না বেড়েই চলছে তখন।

কাজীর দেউড়ি, চট্টগ্রাম থেকে
nurubd@cellemail.net

তন্ময়

- মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম মনির

দিনটি কবে আজ ঠিক মনে নেই। বিশেষ একটা কাজে আমাকে রাজশাহী যেতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে স্টেশনে পৌছাই। টিকেট সংগ্রহ করার জন্য কাউন্টারে গিয়ে শুনতে পারলাম ট্রেন দুই ঘণ্টা লেট। কাউন্টারে ভিড় না থাকাতে খুব সহজেই টিকেট পেয়ে গেলাম। কিন্তু সমস্যা একটা জায়গায়, দর্শনার জন্য বরাদ্দ সংরক্ষিত আসন শেষ হয়ে গেছে। তাই আমার ভাগ্যে কোনো আসন জুটলো না।

এবার দীর্ঘ অপেক্ষার পালা। দীর্ঘ অপেক্ষার পর সমস্ত অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ট্রেন নামের বিশাল যানটি এসে থামে স্টেশনে। ততোক্ষণে স্টেশনে যাত্রী একবারে গিজগিজ করছে। অনেক ঠেলাঠেলি সহ্য করে ইচ্ছা মতো একটা বগিতে উঠলাম। তিন মিনিটের বিরতি। গার্ডের সংকেত পেয়ে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে।

ট্রেন চলছে। আমি বগির ভেতর দিয়ে সামনের দিকে এগোচ্ছি। যে বগিটাতে উঠেছি সেই বগিতেই সামানের দিকে মুখোমুখি দুই সিটের একপাশে একটি সিট খালি আছে। অপর সিটে একজন ভদ্রমহিলা তার ছোট বাচ্চা নিয়ে বসে আছে। মহিলাটি জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। তার পাশে ছোট ছেলেটি একটি খেলনা নিয়ে খেলছে। সামনের সিট খালি দেখে এগিয়ে গিয়ে বলি এক্সকিউজমি, আমি কি এখানে বসতে পারি?

বলতেই মেয়েটি আমার দিকে তাকায়।

ভূত দেখার মতো চমকে উঠি। আমার মনের অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, মল্লিকা, তুমি!

মল্লিকা হ্যাসূচক মাথা নেড়ে উত্তর দেয়, হ্যা, আমি।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। স্থির মূর্তির মতো দাড়িয়ে আছি। মুহূর্তের মধ্যে এলোমেলো হয়ে যায় আমার সমস্ত পৃথিবী। ঠিক কতোক্ষণ এভাবে দাড়িয়েছিলাম বলতে পারবো না। মল্লিকার কথাতেই বাস্তবে ফিরে আসি।

কি ব্যাপার, এভাবে দাড়িয়ে আছো যে, বসতে পারো, অসুবিধা নেই।

একটু নড়েচড়ে হাতের ব্যাগটা ব্যাংকারে রাখতে রাখতে অপ্রস্তুত কণ্ঠে বললাম, না মানে, এভাবে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে তা কখনোই ভাবতে পারিনি।

দেখা হয়েই বা কি এমন লাভ হলো। বরং তারচেয়ে ক্ষতির পরিমাণটা আরো বাড়লো। পুরনো ক্ষতগুলো আবার কাচা হলো, যন্ত্রণা বাড়লো। খুব স্বাভাবিকভাবেই কথাগুলো বললো মল্লিকা।

বুঝতে পারি, আমার ওপর অনেক অভিমান জমা হয়ে আছে তার। জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছো তুমি?

এবার কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো, তুমি তো চেয়েছিলে আমি ভালো থাকি, সুখে থাকি। আর সে কারণেই হয়তো ভালো আছি। বলতে পারো খুব সুখেই আছি।

বুঝতে পারছি, আমার প্রতি তোমার অভিমান এখনো কমেনি।

থাক ওসব কথা। এখন তোমার কথা বলো শুনি।

আমার কথা! একটু হাসার চেষ্টা করে বললাম, আর কি বলবো, এই বেচে আছি! চলে যাচ্ছে দিন। বেচে থাকার চেষ্টা করছি প্রতিদিন।

বিয়ে-শাদি করেছো নিশ্চয়ই? বৌ, ছেলেমেয়ে কেমন আছে তাই বলো।

না, তোমার মতো করে অন্য কাউকে যে ভাবতে পারিনি। তোমার স্থানে অন্য আর কাউকে স্থান দিতে পারলাম কই। তাই তো বিয়ের পিড়িতে বসা হয়ে ওঠেনি। অত্যন্ত শান্তভাবে কথাগুলো বললাম।

এবার আমার মুখের দিকে চেয়ে একটা অবিশ্বাসীর হাসি হাসার চেষ্টা করলো। কিন্তু তা পারলো না। ঠোটের কোণে তা মিলিয়ে গেল।

এমন সময় ট্রেনের হুইসলের শব্দ ভেসে আসে আমাদের কানে। মল্লিকা জানালা দিয়ে মুখ বের করে বাইরের দিকে তাকালো।

আমিও তার দেখাদেখি মুখ বের করে দিলাম বাইরে। দেখলাম সামনে স্টেশন, ট্রেন থামবে। তাই হুইসল দিচ্ছে। মল্লিকা জানালা থেকে মুখ বের করে নিয়ে বললো, আমি সামনের স্টেশনে নামবো।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম, বাচ্চাটি কি তোমার? দেখতে দারুণ হয়েছে, ঠিক তোমার মতো। কি নাম রেখেছো?

তন্ময়।

আমি বিস্মিত হলাম।

খুব অবাক হয়েছো, তাই না? তোমার নামে নাম তাই। অবাক হবারই কথা। নামটা আমিই রেখেছি। তোমাকে হারিয়েছি। কিন্তু ওকে হারাতে পারবো না। ওকে পেয়ে আমার জীবনের সব না পাওয়া দুঃখ, কষ্টগুলো ভুলতে পেরেছি। ওকে হারিয়ে বাচতে পারবো না। আমার সমস্ত পৃথিবী ঘিরে আছে ওই একজন। আমার সমস্ত অণু, তনুতে মিশে আছে এই একজন, *তন্ময়*। আমার ভালোবাসার ধন তন্ময়। আমার শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে চেষ্টা করবো একে আগলে রাখার। বাকিটা আমার নিয়তি।

ততোক্ষণে ট্রেন স্টেশনে ঢুকে পড়েছে। তন্ময়ের মুখে হাত দিয়ে একটু আদর করলাম।

মল্লিকা তার ব্যাগপত্র নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। ট্রেন থামে। মল্লিকা ট্রেন থেকে নেমে আমার জানালার কাছে এসে আমাকে শেষবারের মতো বললো, আমি তোমাকে একটা কথা বলি, কথা রাখা, না রাখা তোমার ব্যাপার। ওই সব পাগলামি ছেড়ে দিয়ে বিয়ে-শাদি করে মানুষ হবার চেষ্টা করো। বলে আর এক মুহূর্তও দেরি করে না সে। তার গন্তব্যের দিকে হাটতে শুরু করে।

শেষবারের মতো আরেকবার তাকে মন ভরে দেখে নিই। প্রচণ্ড আবেগ আর ভালোবাসায় আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। কোনো কথা বলতে পারি না।

দক্ষিণ চাদপুর, দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা থেকে

কার্বন কপি

- রিজভী

ট্রেন শব্দটি শুনলে আমার মনে বাসন্তী বাতাস দোল খেয়ে যায়। আবার ট্রেন শব্দটি শুনলে আমার শুকনো ক্ষতগুলো দগদগে গা হয়ে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কুরে কুরে খেতে থাকে আমাকে, আমার স্মৃতিকে। ট্রেন সম্পর্কে লিখলে মনে হয় যেন আমার লেখা ট্রেনলাইনের মতো দীর্ঘই হবে, কখনো শেষ হবে না। আমার তিনটি বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে ট্রেন কাহিনী শুরু করলাম।

প্রাইমারি পাস করেছি গ্রামের বাড়ি কুমিল্লা থেকে। হাই স্কুলে ভর্তি হলাম চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের বারো আউলিয়াস্থ সবুজ শিক্ষায়তন হাই স্কুলে। আব্বা সেখানে *হাফিজ জুট মিল*–এ চাকরি করতেন। সেই সুবাদে এই পুণ্যভূমিতে আমার আগমন। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর আব্বা গ্রামের কথা এক রকম ভুলেই দিয়েছিলেন। সহজে আমাকে বাড়ি আনতেন না।

সে বছর ঠিক করা হলো গ্রীষ্মের ছুটিতে আমাকে বাড়ি পাঠাবেন। আমি আব্বার সঙ্গে কোয়ার্টারে থাকতাম।

যেই ভাবা সেই কাজ। ছুটি ঘোষণা করা হলো।

আব্বাকে এসে জানালে তিনি বললেন, জিএম তো আমাকে এখন ছুটি দেবেন না।

শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। বুঝি আর বাড়ি যাওয়া হবে না।

পরদিন বিকেলবেলা আব্বা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। বললেন, এখনি বাড়ি যাওয়ার জন্য রেডি হও।

সুবোধ বালকের মতো তাই করলাম। পরে শুনলাম আমাদের পাশের গ্রামের এক বড় ভাইয়ের সঙ্গে যাওয়া হবে। তিনি আব্বার আন্ডারে কাজ করেন।

দুজনে সোজা ট্যাকসি করে কুমিরা রেলস্টেশন এলাম। তাড়াতাড়ি টিকেট করে দুজনে মাঝারি শ্রেণীর একটি ট্রেনে উঠলাম। এর পর দিন সম্ভবত হরতাল ছিল। ফলে অতিরিক্ত ভিড়। দাড়িয়ে রইলাম।

ফেনী স্টেশন পার হওয়ার পর কোত্থেকে বারো তেরো বছরের এক দুঃস্থ অনাথ মেয়ে আমার পাশে এসে দাড়ালো। কিছু পরে হাতাহাতির আওয়াজ পেলাম। চেয়ে দেখি আমার সেই ভাই ওই মেয়েটির বুকে হাত দিতে চাচ্ছে আর মেয়েটি হাত সরিয়ে দিচ্ছে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। সেদিন ট্রেনের ওই বগির শেষপ্রান্তে শুধু একটি লাইট ছিল।

যা বলছিলাম, হাতাহাতির আওয়াজ না পেয়ে কিছু পরে চেয়ে দেখি আমার কথিত বড় ভাই মেয়েটির বুকের সব মাংস মণ্ড বানানোয় ব্যস্ত। আকারে ছোট হওয়ার কারণে অন্যদের চেয়ে ভালোভাবেই ঘটনাটা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। হঠাৎ যেন স্বপ্ন দেখতে শুরু করি। দেখি মেয়েটির পাজামা নিচের দিকে নেমে গেল। পাশের গুহা থেকে লম্বা কি যেন মাথাচাড়া উঠে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জোরে চিৎকার।

আমি তখনো চেয়ে আছি। জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে চারদিকে। আজ ভাবি, সেই বড় ভাইটি কি মানুষ ছিল – নাকি পশু?

১৯৯৩ সাল। আমার প্রাণপ্রিয় মেজ বোন ডলি দীর্ঘ দিন ধরে অসুস্থ। চোখে ঝাপসা দেখেন। মাথা ব্যথা করে। নিচের দিকে তাকাতে পারেন না। তাকালেও তা সামান্য সময়ের জন্য।

বিভিন্ন জায়গায় ডাক্তার দেখানো হলো। ডাক্তাররা কোনো সঠিক প্রেসক্রাইব করতে পারেননি।

অবশেষে অনেক প্রতীক্ষার পর একদিন ডাক্তার আমাদের জানালেন, মেজআপুর ব্রেইন টিউমার হয়েছে।

সবার মাথায় যেন বাজ পড়লো। তাই বলে তো আর চুপ করে থাকা যায় না। ঢাকার পিজি হাসপাতালে আনা হলো। অনেক দিন পর ক্যাবিন পাওয়া গেল। আমাদের জানানো হলো কিছুদিনের মধ্যে অপারেশন করতেই হবে। তাই করা হলো।

আজ একটু পরে ডলিআপুর অপারেশন হবে। ডাক্তাররা আগেই জানিয়েছেন অস্ত্রোপচারের পর রোগী হয়তো সুস্থ মানুষের মতো আচরণ করতে নাও পারে।

তবুও মা–বাবা রাজি।

অপারেশন থিয়েটারে ডলিআপুর কাছে বড় মামা বসে আছেন, কোলে মেজআপুর হাত। মাত্র কয়েক মিনিট পর মামা চলে আসবেন। আপু যাবেন সাজঘরে।

মামাকে চলে যেতে বললেন ডাক্তার।

উঠবেন, এমন সময় বুঝতে পারলেন মেজআপু একটু আগে দুনিয়ার লীলা সাঙ্গ করে চলে গেছেন।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই মামা হতবাক। ঘড়ি যে বন্ধ! অথচ একটু আগে তার হাতের ঘড়িতে সময় দেখলেন।

না পাঠক, এটা কোনো চোখের বিভ্রাট নয়। এ যে সম্পূর্ণ সত্য।

ডেডবডি মামার বাড়ি নোয়াখালি আনা হলো। আমার বড় বোন ও মেজবোন নানার বাড়িতে ছোট থেকে মানুষ হয়েছেন।

আমাদের বাড়িতে ইমার্জেন্সি খবর পাঠানো হলো।

বাড়ির বিভিন্ন লোকজন ট্রেনে করে রওনা দিলাম। আমি তখন ক্লাস ফোরের ছাত্র।

ট্রেনে সবার কান্নাকাটি দেখে একজনকে জিজ্ঞাসা করতেই যখন শুনলাম মেজআপু আর নেই তখন ইচ্ছা করছিল ট্রেন থেকে ঝাপিয়ে পড়ি। আমার এই বোন আমাকে এতো স্নেহ করতেন যে, আমার মা–বাবাও মনে হয় এতো স্নেহ করতেন না। তাকে চিরবিদায় দিতে হবে এ কথা আমাকে ট্রেনে শুনতে হলো! তখন এই ছোট্ট মনে শপথ করেছি, জীবনে আর কখনো ট্রেনে চড়বো না।

২০০৪ সাল। দাড়িয়ে আছি চট্টগ্রামের নিউ মার্কেটের সামনে। ঢাকার বাস কাউন্টারে আসা। কাউন্টারে এসে টিকেট না পেয়ে ছুটে গেলাম চট্টগ্রাম রেলস্টেশনে। উদ্দেশ্য ট্রেনে আসবো। হঠাৎ আমার প্রিয় বোনের উদ্দেশ্যে শপথ করার কথা মনে পড়ে গেল। তুমি আমাকে ক্ষমা করো আপু, আমি কথা রাখতে পারলাম না।

টিকেট কেটে ট্রেনে বসতে যাবো, এমন সময় দেখি জানালার পাশে আমার সিটে এক ভদ্র চেহারার অভদ্র লোক বসে আছে। তাকে উঠতে বলতেই বিভিন্ন অজুহাত দেখাতে লাগলো। অগত্যা বসতে হলো আমার কাঙ্ক্ষিত সিটের পাশে।

বসে মনে মনে অকথ্য ভাষায় লোকটিকে গালাগাল করতে লাগলাম। এমন সময় চোখ পড়লো বোরখা পরিহিত অতি সুদর্শন এক মহিলার দিকে যিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। পাশে দুই বাচ্চা ও স্বামী।

ওই ভদ্র মায়াবী মহিলার সিট ছিল আমার পাশে দুই সিট বিপরীতে। ফলে সামনে তাকালেই তাকে দেখতাম। বেশ কিছু পরে ওই মহিলার দিকে তাকাতেই দেখি এখনো আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

চোখ ঘুরিয়ে নিলাম। কিন্তু পরে যখন বুঝতে পারলাম তিনি এখনো আমার দিকে তাকিয়ে আছেন তখন আমিও তাকিয়ে থাকলাম।

এভাবে টানা চার ঘণ্টা। শুধু মাঝে মধ্যে স্বামী, ছেলে সন্তানের সঙ্গে দুই একটি কথা বলে নিচ্ছেন।

একবার ভাবলাম গিয়ে জিজ্ঞাসা করবো আমাকে চেনেন কি না। পরে ভাবলাম দরকার নেই। আবার কি হতে কি হয়!

ওই শ্রদ্ধেয় মহিলার প্রথমে নেকাব থাকলেও পরে আমার চাহনিতে খুলে ফেলে যা ছিল আরো রোমাঞ্চকর। একবার হিসাব করে দেখলাম হয়তো আমার মতো তার কোনো ছেলে ছিল যে মারা গেছে বা নেই।
পরে যে ফলাফল পেলাম তা হলো, তার যে বয়স তাতে আমার বয়সী ছেলের প্রশ্নই আসে না।
সেদিন টঙ্গী ট্রেন অপেক্ষা করার কারণে ঢাকায় আসতে মোট সময় লাগলো সাড়ে আট ঘণ্টা। এই পুরো সময়ের সাত ঘণ্টাই তিনি আমার পানে তাকিয়ে ছিলেন।
সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেলাম যখন এয়ারপোর্ট স্টেশন নামার সময় আমার উদ্দেশ্যে কয়েক ফোটা চোখের পানি ফেলে গেলেন। হয়তো বা কিছু বলার ছিল। স্বামীর কারণে বলতে পারেননি।
আজ এই প্রিয় যাযাদির মাধ্যমে প্রথমে তাকে জানাই আমার সালাম। দ্বিতীয়ত. তার অশ্রুজল এখন আমার কাছে নায়াগ্রা জলপ্রপাত হিসেবে ধরা দেয়। জানি না তিনি কোনো দূত, তার ফেলে যাওয়া স্মৃতি শোধ করতে পারবো কি না সন্দেহ। যেখানে থাকুন, ভালো ও সুস্থ থাকুন। যদি তিনি কিছু বলতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন। পাঠক, আমার প্রয়াত বোন ডলির কার্বন কপি ছিল ওই মহিলা যা আমার নিজের বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। পুনর্জন্মে বিশ্বাস করি না। কিন্তু ওই ঘটনার পর বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছি।
তার চোখের জল যেন আমাকে বলে গেল, রিজভী তুই না আমার উদ্দেশ্যে শপথ করেছিস আর কখনো ট্রেনে চড়বি না? এখন তুই এখানে কেন? তুই আমার এক ভাই, এতো দূরের পথ তোকে একা যেতে দিল কেন। আর কখনো একা ট্রেনে চড়িস না।
বিদায় নেয়ার আগে আমার ওই আপুর কাছে আরেকবার ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। সুখে ও শান্তিতে থাকুন। দোয়া করবেন এই প্রত্যাশা করি।
কমলাপুর স্টেশন নেমে আমার পাশে বসা লোকটিকে মনে মনে এবার ধন্যবাদ জানালাম যার জন্য আমার এই প্রাপ্তি। ক্ষমা চেয়ে নিলাম আগের ঘটনার জন্য।

মধ্য বাসাবো, ঢাকা থেকে
rejvei@yahoo.com

পারাবত ট্রেনে

নূর ভূইয়া

আমার হাতে ঘড়ি নেই। পাশের লোকটির হাত থেকে চোরাই চোখে দেখে নিলাম বিকাল সাড়ে চারটা। দিনটি ছিল ১৩ মে ২০০৩। ঢাকায় আসছি। গিয়েছিলাম সিলেটের জকিগঞ্জ। আমার আংকল সেখানকার বড় অফিসার।
পারাবত ট্রেনটি পাহাড়ের মধ্য দিয়ে ছুটে চলছে। আজকে আমি তেমন বোরড (Bored) নই। জার্নিটাও বেশ আরামদায়ক মনে হচ্ছে। প্রয়োজনীয় খাবার-দাবার সঙ্গে নিয়েছি। হাতে আছে বেশ কয়েকটা ম্যাগাজিন। এছাড়া মেডিকাল কলেজ আজ ছুটি হয়েছে। বেশ কিছু নারী সহযাত্রীও উঠেছে আমাদের কামরায়।
আমার সিট থেকে বাম দিকে আট দশ রো দূরে আমার বয়সী একটি ছেলে একটু পর পর আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে অবাক হলাম। মনে হচ্ছে ছেলেটার সঙ্গে আগে কোথাও পরিচয় হয়েছে। কি জানি ছেলেটার মনে হচ্ছে কি না?
ছেলেটার কিছুটা সামনে বিশ বাইশ বছর বয়সী একজন মহিলা বড় কালো সানগ্লাস পরে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। এতোক্ষণ সানগ্লাসটা ছিল না, খাওয়া-দাওয়া নিয়ে ব্যস্ত ছিল।

এর সামনে বাচ্চাসহ মহিলাটি একটা আপেল হাতে নিয়ে চা বাগান দেখছে। সত্যিই চা বাগান এক মনোরম দৃশ্য! তাকিয়ে থাকলে মনে ছায়া তৈরি হয়। এই ছায়া মনের সব নড়বড়ে উদ্বেগকে ভুলিয়ে দেয়। তাই তাকিয়ে থাকা যায় কবিদের মতো দীর্ঘ সময়।

এরপরের এক সারি পুরুষ। ওদের সামনে আমার দিকে পেছনে ফেরা কালো বোরখা পরা মহিলাটি শীর্ষেন্দুর *পার্থিব* পড়ছে।

ওদের পেছন থেকে আমার বাম দিকসহ পর পর তিন সিটে মেয়ে। আমার আটচল্লিশ নাম্বার সিটটি ওদের মাঝখানে ছিল। স্কুল ব্যাগ হাতে যে মেয়েটি বসা আছে ওর অনুরোধে ডান দিকে আসতে হয়েছে।

সবচেয়ে কাজের কাজ করছে আমার বাম দিকের সামনের মেয়েটি। ডান পায়ের জুতাটা খুলে বাম পায়ের ওপর পা–টা তুলে ডান দিকে দেমাকি ব্যাগটা (ইংরেজি ভ্যানিটি = দেমাক) রেখে গোলাপি রঙের ওড়নায় সবুজ সুতা দিয়ে হাতের কাজ করছে। ওর বামের বান্ধবী সামনের সিটে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে দীর্ঘ সময় ধরে। এদিকে ওর কোনো তোয়াক্কা নেই।

জীবনে এই প্রথম দেখলাম ট্রেনে বসে উৎপাদনমুখী কাজ করতে।

আশপাশের মেয়েদের সঙ্গে ওর সম্পর্ক আছে কি না জানি না। তবে সবাইকে লক্ষ্য করছি ওর ওড়নাটা নিজের হাতে নিয়ে দেখতে। আমার মনে হয় সম্পর্ক না থাকলেও মেয়েরা একজন আরেকজনের দিকে তাকালেই সম্পর্ক হয়ে যায়। তাছাড়া সম্পর্ক না থাকলেও একে অন্যের জিনিস দেখতে পারে নির্বিঘ্নে।

দুজন লোক চা বিক্রি করছে। প্রতি কাপ পাচ টাকা। একটা বড় পলিথিনের বস্তায় করে ট্রেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের চিপস। বাইরের সাত আট টাকার প্যাকেট এখানে দশ টাকা। ট্রেনে ওঠার আগে বাজার থেকে খাবার–দাবার কিনে নেয়া মনে হয় বুদ্ধিমানের কাজ।

আমার ডানপাশের লোকটি ঘুমাচ্ছে। জানালার পাশে বসে আমার মতে ঘুমানো উচিত নয়। মনে মনে মেয়েটার প্রতি বিরক্ত হচ্ছি। তা না হলে জানালার পাশেই বসতে পারতাম।

আমার বাম দিকের মেয়েটি যার বামে আমার সিট ছিল, এই মেয়েটিও বাম পায়ের জুতা খুলে ডান পায়ের ওপর পা রেখেছে। তবে সামনের মেয়েটির সঙ্গে ওর পার্থক্য হলো, পায়ের নখে ম্যাজেন্টা কালারের নেইল পলিশ আর বৃদ্ধা আঙুলের পাশের আঙুলে আংটি। ভাবলাম ওদের সাজার কতো জিনিস যে আছে!

ওর বাম দিকের যে মেয়েটির সঙ্গে আমার সিট বিনিময় হয়েছে ওই মেয়েটির ভ্রূগুলো চোখে পড়ার মতো। পার্লারের কাজ করানো হলেও বেশ বড় বড় এবং মোটা। লক্ষ্য করলাম ওর গোফগুলোও বয়স্ক ছেলেদের মতো। তবে দেখতে খুব চমৎকার লাগছে।

ট্রেনটি একটু থেমেছে। ওড়নার কাজ দেখতে অন্য কম্পার্টমেন্টের সুন্দর একটা মেয়ে এসেছে। খুব হাসি হাসি ভাব নিয়ে কথা বলছে। মেয়েটি আমার দিকে পেছন ফেরা। শাদা হালকা কামিজের নিচে শাদা শেমিজ। তার নিচে লাল রঙের ব্রা। ওটাও শাদা হলে কম আন্দাজ করা যেতো। কিন্তু লাল হওয়াতে সহজেই চোখে পড়ছে। এছাড়া দাড়িয়েছেও একদম আমার কাছাকাছি।

মাঝে মধ্যে ট্রেনের স্পিড খুব বেড়ে যায়। ওই সময় জানালা দিয়ে গাছগাছালি দেখা যায় না। এই মাত্র একটা ট্রেন পাশাপাশি ক্রসিং হলো। দুটির স্পিডই ছিল খুব বেশি। পাশের ট্রেনটিতে মানুষ ছিল কি না বুঝতে পারিনি।

এখন আমার পাশের মেয়েটিও ঘুমোচ্ছে। মেয়েরা বাসায় ঘুমালে দেখেছি মায়েরা ওদের রুমে যেতে দেয় না। ভেবেছিলাম ওরা হয়তো অন্য কায়দায় ঘুমায়। এখানে দেখলাম পার্থক্য নেই।

আমার বাম দিকে পেছনের সারিতে কালো, লম্বা একটা লোক উঠেছে। ওনার হাতে একটা মোবাইল। চুলগুলো একদম ছোট। এই লোকটির বামে বসেছে হালকা সবুজ কাপড়ের ওপর সবুজ–হলুদ কাজ করা

সেলোয়ার, কামিজ ও ওড়না পরা খুব সুন্দরী একটি মেয়ে। মেয়েটির বয়স সতেরো আঠারোর বেশি হবার কথা নয়। পাশের লোকটি অবশ্যই স্বামী। নতুন বিয়ে হয়েছে বোঝাই যায়। লোকটির হাত নিয়ে মেয়েটি খেলা করছে। মাঝে মধ্যে নিজের হাত নিয়ে লোকটির থুতনিতে শেভ করার পর যেভাবে আফটার শেভ লাগায় ঠিক সেভাবে ঘষে দিচ্ছে।

একবার দেখলাম লোকটি মেয়েটির উরুতে হাত রেখেছে। আর মেয়েটি ওর কাধের ওপর হাত রাখার জন্য টেনে ধরছে।

আসলে ট্রেনে এসব জিনিস এনজয় করার মতো। আমার বাম দিকের সামনের বিশ বাইশ বছর বয়সী মহিলাটিকে পাশের লোকটি চোখের সামনে ম্যাগাজিন ধরে কি যেন পড়াচ্ছে।

তবে বার বার আমার দৃষ্টি চলে যাচ্ছে বাম দিকে পেছনে। এখন ওই মেয়েটি বাম হাতের উল্টো পিঠ নিজ হাতে বুকে চেপে ধরছে। এবার লোকটির বাম হাতের আঙুল মুখে নিয়ে চুষছে। সব সময় তাকানো লজ্জাজনক ও অস্বস্তিকর, অপরাধও মনে হচ্ছে।

তবে কেউ যেন না দেখে সেইভাবে আড়চোখে এনজয় করছি। এবার লোকটিকে দেখলাম মেয়েটির পিঠের পেছন দিয়ে হাত নিয়ে ওর বাম হাতের নিচ দিয়ে আস্তে করে বুকে চাপ দিচ্ছে আর ডান হাতে ওড়নাটা টেনে বাম হাতটাকে ঢেকে দিয়েছে।

আমার সামনের কম্পার্টমেন্টে মনে হয় তাবলীগের লোক উঠেছে। নামাজের সময় হলে তা বোঝা যায়। ওনারা দল বেধে হুজুরানা পোশাকে একদম নিচের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে যাওয়া-আসা করেন।

একটু আগে ওনারা যখন যাচ্ছিলেন তখন কে যেন বলে উঠলো, লাদেন বাহিনী।

আমার ডান পাশের লোকটির সঙ্গে অনেক্ষণ বিভিন্ন বিষয় নিয় গল্প হলো। পলিটিক্সের গল্প, বাম দিকের ওই লোকটির গল্প, মেডিকাল কলেজের এই ছাত্রীদের গল্প। এরপর আমার গল্প, ওনার গল্প।

ওনার নাম এমরান। তিনি মুগদায় ওয়েসিস কিন্ডারগার্টেনের প্রতিষ্ঠাতা। ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে ১৯৯৩ সালে মার্কেটিংয়ে মাস্টার্স করেছেন।

আমাদের সামনেও দুটো মেয়ে। জানতে পারলাম সম্পর্ক আছে। ওরা এইমাত্র আমাকে বড় সাইজের একটা পেয়াজু খাওয়ালো। সঙ্গে একটু সালাদ জাতীয় পেয়াজ ছিল, আমি খাইনি।

আমিও ওদেরকে *মেরিডিয়ান চিপস* খাওয়ালাম। আমার ম্যাগাজিনটা চাওয়াতেই তৎক্ষণাৎ দিয়ে দিলাম। ওদের সঙ্গে আমার কথা হয়নি। তবে ভালো লাগছে। কারণ আমার ম্যাগাজিন ওরা পড়ছে।

পাশের লোকটি অনেকক্ষণ চুপচাপ। আমি লিখছি বলে কোনো কথা বলেননি। আবারও আড়চোখে ঘড়িটি দেখে নিলাম। একদম কাটায় কাটায় সাতটা। কখন যে, আড়াই ঘণ্টা কেটে গেল বুঝতেই পারিনি।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে

ভণ্ড প্রেমিক

- সেতারা বেগম

মাঝে মধ্যে অনিদ্রাকে দৃষ্টিহীনতা বলে মনে হয় আমার। যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকি, কাটা-ছেড়া জীবনে বিভীষিকাময় দৃশ্যাবলীর শ্রবণ বর্ষণ আমাকে অশ্রুসিক্ত করে তোলে। ইদানীং আমার ঘুম হয় না। নিদ্রার সর্বোচ্চ মিলিগ্রাম ট্যাবলেটও আমার স্নায়ুতন্ত্র নির্জীব করতে পারে না। বার বার অতীতের কথা মনে হয়।

১৯৯১ সালে এইচএসসি পরীক্ষা শেষে বাবা মায়ের অনুমতি নিয়ে ছোট ভাইকেসহ ছোট খালার বাড়ি সিলেটে যাওয়ার জন্য তৈরি হলাম। রাত দশটায় কমলাপুর স্টেশন থেকে টেনে উঠলাম। ট্রেন যখন চলতে আরম্ভ করলো তখন সবাই ঘুমানোর চেষ্টা করছে।

হঠাৎ চোখ পড়লো এক ভদ্রলোকের ওপর। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। খুব শান্ত ছিল তার দুই চোখ। বয়স হবে বেয়াল্লিশ তেতাল্লিশ। দেখতে পাকিস্তানের কৃকেট খেলোয়াড় ইমরান খানের মতো। প্রথম দর্শনে যেকোনো মেয়েই প্রেমে পড়ে যাবে।

সারা রাত না ঘুমিয়ে তাকেই দেখলাম। তিনিও আমাকে দেখলেন। ট্রেনের মধ্যে বেশ কয়েকবার টয়লেটে গেলেন এবং আমাকেও চোখে ইঙ্গিত দিলেন যেন আমি তার পেছনে যাই।

সকালে ট্রেন সিলেটে থামলো। হঠাৎ তিনি আমাকে একটি চিঠি দিয়ে ট্রেন থেকে নেমে গেলেন। আমার মনে হচ্ছিল যদি ওই রাতটা না শেষ হতো তাহলে তাকে আরো দেখতে পেতাম। মনে হলো, লোকটার প্রেমে পড়ে গেছি।

তার দেয়া চিঠিটি স্টেশনের টয়লেটে ঢুকে পড়লাম। চিঠিতে লেখা ছিল, *আমি খালেদ। উত্তরা আলাওল এভিনিউতে থাকি। লেদারের ব্যবসা করি। আমাদের জুতার শোরুম আছে বেশ কয়েকটি। সঙ্গে ফোন নাম্বার। ইচ্ছে হলে যোগাযোগ করতে পারেন। দুই দিনের জন্য ব্যবসার কাজে সিলেট এসেছি।*

যাই হোক। পাচ দিন সিলেট থেকে ট্রেনে আবার ঢাকায় এলাম। ট্রেনে বার বার খালেদের কথা মনে হচ্ছিল।

ঢাকায় এসে খালেদকে ফোন করলাম।

তিনি তার বাসায় নিমন্ত্রণ করলেন।

যথাসময় তার বাসায় গেলাম।

তিনি যথেষ্ট আপ্যায়ন করেছেন এবং আমাকে বিয়ার খেতে বললেন।

এই প্রথম বিয়ার ধরলাম। খেতে খারাপ লাগলো। তবুও খেলাম। বিয়ার খেতে খেতে শুনলাম তার স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেছে। এ বাড়িতে তিনি এবং দুটি কাজের লোক থাকে।

এদিকে তিনটি বিয়ার খাওয়ার পর আমার মাথা ঘুরছিল। চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল।

এ সময় তিনি আমাকে চুমু খেলেন, ব্লাউজের বোতাম খুলে স্তনগুলো নিয়ে খেলা করলেন।

আমার যৌবন হওয়ার পর কোনো পুরুষ প্রথম বুকে হাত দিল।

আস্তে আস্তে বিবস্ত্র করে আমার শরীরটাকে নিয়ে তিনি খেলায় মেতে উঠলেন।

মানুষের শরীরের খেলায় যে এতো সুখ জানতাম না।

বেশ কয়েকদিন দেখা করার পর তিনি আমাকে ভালোবেসে ফেলেছেন এবং বিয়ে করবেন বললেন।

আমরা শরীরী খেলায় মেতেছিলাম। এক সময় অনুভব করলাম, আমি গর্ভবতী।

তিনি যখন বুঝলেন আমি গর্ভবতী তখন তার বাড়ির দরজা আমার জন্য বন্ধ হয়ে গেল।

একদিন তার বাড়িতে হঠাৎ হাজির হলাম।

দারোয়ান আমাকে ভালোভাবে চেনে, অথচ দারোয়ান আমাকে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। কারণ তার মালিক মি. খালেদ বেডরুমে অন্য এক বড়লোক মেয়ের সঙ্গে সেক্স করছেন।

জোর করে বাড়িতে ঢুকে তার বেডরুমের দরজায় নক করলাম।

তিনি রাগান্বিতভাবে দরজা খুলে আমার গলা চেপে ধরলেন। কেন এলাম তার বাড়িতে! আমার পেটে কয়েকটি লাথি দিলেন। তখন তার পেছনে ছিল তার নতুন বান্ধবী। বান্ধবীটি পেছন থেকে বলে উঠলো, আমাকে কয়েকটা টাকা দিয়ে যেন বিদায় করে দেয়।

কাজের লোকরা আমাকে টানাটানি করে গেটের বাইরে রেখে গেল।

তখন দারোয়ানটা আমাকে বলে, মা, আপনি আর এখানে আসবেন না।

আগেও অনেক মেয়ে এখান থেকে কুমারী মা হয়ে ফিরে গেছে শুনলাম।

বাবার ড্রয়ার থেকে টাকা চুরি করে বাচ্চা নষ্ট করলাম।

কিছুকাল পর এক বাবার এক ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হলো। আশ্চর্য হলাম, আমার বিয়েতে খালেদ পাচ হাজার টাকার একটি প্যাকেট পাঠিয়েছিল। কিন্তু খামে তার নাম ছিল না।

খালেদ ছিল আমার প্রথম প্রেম। তার দেয়া চিঠি, ডায়রি, ছবি সব কিছুই আজও যত্ন করে রেখেছি।

প্রথম সন্তান নষ্ট করাতে আজ দশ বছরেও মা হতে পারিনি। আমার শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামী আমাকে দেখতে পারেন না। শারীরিক ও মানসিক কষ্ট দিয়েছে একটি সন্তান কেন হয়নি, তাই। শেষে বাড়ি থেকে বের করার জন্য পানিতে বিষ দিয়েছে যেন মরে যাই। প্রতিবেশীরা হাসপাতালে নিয়ে আমাকে সুস্থ করেছে। সেই থেকে বাবার বাড়ি।

এই বয়সে দুনিয়ার মানুষের এতো অবহেলা পেয়েছি যে, আর বেচে থাকতে ইচ্ছা করে না। মৃত্যুর আগে একটিবার যদি খালেদকে দেখে যেতে পারতাম!

এরপর কতোবার ট্রেনে চট্টগ্রাম, সিলেট গিয়েছি আর খালেদকে খুজেছি। সে কোথায় আছে আজ বলতে পারবো না। সে যেখানেই থাকুক, সুখে-শান্তিতে থাকুক এটাই কামনা করি।

গুলশান, ঢাকা থেকে

কৌতুক

- মিল্টন রোজারিও

ট্রেন মানেই ছোটবেলায় কু-ঝিক কু-ঝিক মুখে আওয়াজ তুলে একজন আরেকজনের ঘাড়ে হাত দিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার খেলার কথা মনে পড়ে যাওয়া। মামার বাড়ি যাওয়ার একমাত্র বাহনটা নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা পরে এলে কতো যে অভিমান করতাম তা ভাষায় প্রকাশ করার নয়। আরো খারাপ লাগতো শুধু শুধু দাড়িয়ে থাকতো যেনতেন স্টেশনে। পরে এসে আগে যেতো যে ট্রেনটা (ইন্টারসিটিকে লাইন ক্লিয়ার করে দিতো), মনে হতো ওটাতে উঠে চলে যাই অজানা পথে। এই আধুনিক যুগেও লাইন চেঞ্জিং দেখতে ইচ্ছে করে।

ছোটবেলায় অবাক বিস্ময়ে যেমন দেখতাম রেলগাড়ির চাকায় সাইকেলের মতো হাওয়া দিতে হয় না কিংবা *প্রয়োজনে ট্রেনের চেইন টানুন, অপ্রয়োজনে দুইশ টাকা জরিমানা*। তখন মনে হতো যদি পকেটে টাকা থাকতো তবে চেইন টেনে দুইশ টাকা ওই হ্যান্ডলের সঙ্গে লাগিয়ে যেখানে-সেখানে ট্রেন থামিয়ে দিই। এখন হরহামেশা চেইন টানা হয় যার অগ্রভাগে রয়েছে চোরাকারবারীরা।

সংগ্রামী বাংলাদেশিরা সংগ্রাম করে ঈদের সময় দুটো টিকিট যোগাড় করে। প্রচণ্ড ধৈর্যের পরিচয় দেয় ট্রেন দেরি বা যেখানে-সেখানে দাড়িয়ে থাকলে। দাড়িয়ে থেকে নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে গেলেও নিজের সিট নেই কেন এই প্রশ্ন করে না কর্তৃপক্ষকে। বিপরীতে অনেক যাত্রী টিকেট না কেটে ট্রেনে ওঠে। যেখানে-সেখানে ট্রেনের চেইন টেনে অন্য যাত্রীদের বিরক্ত করে ওই একই যাত্রীরা। সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে অনেক কথা থাকলেও আমি কয়েকটি রেল সম্পর্কিত কৌতুক শোনাচ্ছি।

● হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসা এক ট্রেনের যাত্রী অপর এক যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করছে, কি ব্যাপার ভাই, আজ সময় মতো ট্রেন এসে পৌছালো?

অপর যাত্রী নির্বিকারভাবে উত্তর দিল, এটা গতকালের এই সময়ে ট্রেন ছিল।

ট্রেন যদি এক ঘণ্টা দেরি করে এবং যাত্রী যদি ঘড়ি দেখে প্রশ্ন করে তবে উত্তর হবে, ঘড়ি নয়, পেছনে ক্যালেন্ডার দেখে জেনে নিন এটা কবেকার ট্রেন।

ট্রেন যে দেরি হয় তাও প্রকাশ পেয়েছে এই কৌতুকটাতে।

● একজন আত্মহত্যা করবে বলে ট্রেনের লাইনের ওপর বসে আছে। সঙ্গে টিফিন বাটি। লাইনের ওপর বসে থাকার কারণ জানতে চাইলে লোকটি জানালো, সে আত্মহত্যা করতে চায়। কৌতূহলী পথিক সঙ্গের টিফিন বাটির কথা জিজ্ঞাসা করলে, লোকটি আগ্রহ নিয়ে উত্তর দিল, কখন ট্রেন আসে ঠিক নেই তো, তাই ক্ষিধে লাগলে খেয়ে নেবো ক্ষণ।

● এক যাত্রী ট্রেনের ওপর ছোটাছুটি করছেন। তাই দেখে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই, আপনি এতো ছোটাছুটি করছেন কেন?

লোকটি জানালেন, তার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

● অগ্রিম টিকিট না কাটা থাকলে বা পাওয়া না গেলে ট্রেনে ওঠার সময় ধাক্কাধাক্কির কারণে পকেটমার হতেই পারে, তবু শুধু একটি সিট দখল করার জন্য এটুকু ঝুকি নিতে আপত্তি নেই। সিট দখল যুদ্ধে জয়ী হয়ে আপনার পাশের সিটে রকমফের যাত্রী পেতেই পারেন। যদি পেয়ে যান এমন যাত্রী –

যাত্রীর কাছে টিকেট চেকার টিকিট চাইলে যাত্রী নিজের ও হাফপ্যান্ট পরুয়া বাচ্চার হাফ টিকেট দেখান।

তাই দেখে মাতাল যাত্রীটি টিকেট চেকারের সামনে সব কাপড় খুলে বললো, হাফপ্যান্ট হাফ টিকেট, নো প্যান্ট নো টিকেট।

আপনি বিব্রতকর অবস্থায় পড়লে অপর দুই যাত্রীর কথা শুনুন।

● টিকেট চেকার টিকেট চাইলে প্রথম যাত্রী জানালো, চিঠি যদি দুই টাকার খামে বাংলাদেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত যেতে পারে তবে আমরা কেন পারবো না। বলেই দুই টাকার টিকেট কপালে লাগিয়ে দিল।

পাশের জনের কাছে টিকেট চাইলে দ্বিতীয়জন উত্তর দিল, আমি বেয়ারিং (যে চিঠি পাঠাতে প্রেরকের নয়, প্রাপকের টাকা লাগে)।

চেকার এবার পা থেকে জুতা খুলে দুজনের কপালে সজোরে মারলেন। যাত্রী দুজন রেগে প্রশ্ন করলো, কপালে জুতা দিয়ে মারার কারণ।

চেকার শান্তভাবে উত্তর দেন, শুধু টিকিট লাগালে হবে? সঙ্গে পোস্ট অফিসের সিল লাগাবেন না?

● যাত্রাপথে রেললাইনের আশপাশে রয়েছে গাছপালার বাড়তি ডালপালা কিংবা দুষ্ট ছেলেদের ঢিল। বমি করবে বা ঠাণ্ডা লাগছে এ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় জানালার পাশে বসা বা জানালা বন্ধ রাখা। কিন্তু ঘটনাটা যদি ঘটে হানিফ সংকেতের ইত্যাদিতে প্রচার হওয়ার ঘটনাটা।

অসুবিধা হচ্ছে বলে একজন চাচ্ছেন জানালা বন্ধ করতে, অপরজনের সুবিধা হবে বলে চাচ্ছেন জানালা খোলা রাখতে। এ নিয়ে বাকবিতণ্ডা। হঠাৎ দুজনেই খেয়াল করলেন, জানালার কাচ নেই।

● আবার যদি হঠাৎ বাথরুমে যাবার প্রয়োজন পড়ে তবে বাথরুমে প্রবেশ করে দেখা যাবে বাথরুমের ছিটকিনি নেই, কল খুলে পানি পড়ছে, ছোট আয়নাটাও খোয়া গেছে। এছাড়া আরো দেখতে পাবেন *দেশের সম্পদ – আপনার সম্পদ, এগুলো রক্ষা করা আপনার দায়িত্ব* মূল্যবান কথাটির পাশে ছোট্ট করে শাদা লেখা, আমার সম্পদ আমি নিয়ে গেলাম (আয়না, কল, ছিটকিনি এসব খোয়া যাওয়ার কারণে)। ফৃর যুগে ফৃ দেখতে পাবেন সভ্য জাতির অসভ্য কিছু লোকের কথাবার্তা, মোবাইল নাম্বার, কাচা হাতের কিছু পাকা অশ্লীল ছবি।

ইনডিয়ার বিখ্যাত কৌতুক অভিনেতা জনি লিভার স্টেজ অনুষ্ঠানে এই কৌতুকটা বলেছিলেন। একটি ট্রেন খুবই স্বাভাবিকভাবেই চলছিল। হঠাৎ যাত্রীরা ঝাকুনি অনুভব করলো এবং দেখলো ট্রেনটা লাইনের ওপর নেই। বিভিন্ন ক্ষেতখামার, পথ–ঘাট দিয়ে যাচ্ছে। এক পর্যায়ে ট্রেন বিকট শব্দে দাড়ালে যাত্রীরা আতংকিত, ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে জানালা দিয়ে বাইরে মুখ বের করে দেখতে চাইলো কি ঘটনা ঘটেছে। চালককে এক যাত্রী জিজ্ঞাসা করলো, কেন আপনি ট্রেনটাকে লাইনের বাইরে নিয়ে গেলেন?

চালক তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, একজন লোক লাইনের ওপর দাড়িয়েছিল।

যাত্রীটি তখন রেগে বললেন, এতোগুলো যাত্রীকে নিয়ে আপনি পথে-ঘাটে নেমে গেলেন? কেন আপনি ওই লোকের ওপর দিয়ে ট্রেন চালিয়ে গেলেন না?

চালক বললো, ওই লোকটিকে খোজার জন্যই তো রাস্তা ছেড়ে পথে-ঘাটে যেতে হয়েছে।

● আমাদের যোগাযোগমন্ত্রী পাতালরেলের কথা বলেন। এ প্রসঙ্গে লেখক মুহম্মদ জাফর ইকবাল একটা হিসাব দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, এক মাইলের পাতালরেলে যে পরিমাণ টাকা খরচ হবে সেই টাকা দিয়ে বাংলাদেশে অনেক কিছুই করা সম্ভব। পাতালরেল আমাদের জন্য বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই না।

যোগাযোগ মন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে সংসদে দাড়িয়ে অভিনেতা কাম এমপি, আসাদুজ্জামান নূর বলেছিলেন, আপনার নামের শুরুতেই *না*। তাই যেকোনো কিছুতেই আপনি না করেন।

প্রতি উত্তরে মন্ত্রী বলেছিলেন, শুরুতে না বললেও মুখে হ্যা বলি।

মন্ত্রী, আপনি পাতালরেলের শুরুতে অর্থাৎ মূলেই না বলুন। বাংলাদেশের অনেক খাত রয়েছে যেখানে টাকা খরচ করলে লাভ হবে। আর রেল খাতে শুধু সময়ানুবর্তিতা, ব্ল্যাক টিকেট (ঈদের সময়), যথাযথ তদারকির মাধ্যমে রেলখাতের উন্নতি করা সম্ভব।

আমরা যারা ট্রেনের যাত্রী আছি, আসুন আমরা সবাই টিকেট কেটে ট্রেন ভ্রমণ করি। আর রেল কর্তৃপক্ষের কাছে একটা অনুরোধ, আপনার ট্রেন সময় মতো নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে দিয়ে দায়িত্ব পালন করুন। ঈদের সময় টিকেট কালোবাজারিদের হাতে ছাড়বেন না। আরো হয়তো ভুল-ত্রুটি আছে, আপাতত এ দুটো দেখলেই হবে।

রাজশাহী থেকে

লাকি থার্টিন

- আকবর হোসেন

ঢাকাতে যাচ্ছিলাম একটা বিশেষ কাজে চাচার বাসায়। শ্রীমঙ্গলে এসে ট্রেনের টিকেট কাটলাম ফার্স্ট ক্লাসের। তারপর ট্রেনের জন্য অপেক্ষা। সময় কাটছে না। সাত টাকা দিয়ে একটা ম্যাগাজিন কিনলাম পড়ার জন্য। ভ্রমণের সময়টা কাটাই বই ও ম্যাগাজিন পড়ে। পড়তে পড়তে যদি সেটা শেষ হয়ে যায়, তারপরও আবার পড়ি। কারণ দ্বিতীয়বার পড়লে আরো ভালো লাগে। মনে হয় এবার আরো নতুন কিছু পেয়েছি।

ট্রেন যথাসময়ে এসেছে। আমার সিট নাম্বার তেরো মানে আনলাকি থার্টিন। ট্রেনে উঠে দেখি আসলেই আমি আনলাকি, আমার সিটে একটা মেয়ে বসা। সে ডায়রি পড়ছে।

বললাম, আপনার সিট নাম্বারটা, প্লিজ!

সে বললো, বারো।

তখন একটু স্বস্তি পেলাম। বললাম, আমারটা তেরো মানে, আমারটা জানালার দিক। আপনারটা করিডোরের পাশে।

মেয়েটি বললো, আমি এখানে বসলে সমস্যা আছে?

মুখের ওপর তো আর হ্যা বলতে পারি না। বললাম, না, বসুন।

তারপর আর কি! বসে পড়লাম বারো নাম্বার সিটে। ওয়াকম্যানটা অন করে গান শুনে ম্যাগাজিন পড়া শুরু করলাম। পড়তে পড়তে হঠাৎ খেয়াল করলাম মেয়েটি কাদছে। বললাম, কোন সমস্যা?

মেয়েটি বললো, না।

বললাম, ঠিক আছে।

ম্যাগাজিন পড়া শুরু করলাম। কিছুপর মেয়েটি আবার কাদছে। এবার বললাম, কিছু মনে করবেন না। কোনো সমস্যা হলে আমাকে বলতে পারেন। আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

মেয়েটি কিছু বলছে না।

তার নাম জিজ্ঞাসা করলাম।

অনেকক্ষণ পর বললো, তার নাম বিথী।

বললাম, খুব সুন্দর নাম। কোথায় যাবেন?

ঢাকা।

আমিও ঢাকা যাবো।

সে আমার নাম জিজ্ঞাসা করলো।

আমার নাম বললাম।

সে বললো, আপনার নামটাও সুন্দর।

বললাম, ধন্যবাদ।

এবার তাকে বললাম, যেহেতু আমরা দুজন একই বয়সের সেহেতু আপনি বলার দরকার নেই, কি বলো?

সে হাসলো।

মেয়েটির হাসি এতো সুন্দর। এ রকম একটি মেয়ে যে কাদতে পারে ভাবাই যায় না! কান্না তার চোখে মানায় না।

এবার বলো, ঢাকায় কোথায় যাবে?

সে চুপ করে রইলো। কিছু বলছেন না।

কি ব্যাপার, বলো কোথায় যাবে?

মিরপুরে যাবো।

কার কাছে?

মিরপুর দশ নাম্বার আমার বান্ধবী থাকে, তার বাসায় যাবো।

কেন যাবে?

এমনিতেই।

ঠিক আছে। এবার বলো, একটু পর পর শুধু কাদছো কেন।

এমনিতেই।

এমনিতেই কারো কাদতে এই প্রথম দেখলাম।

সে কিছু বললো না।

আবার বললাম, তুমি আমাকে বন্ধু ভাবতে পারো। বলো আমাকে ব্যাপার।

এবার সে বললো, আমি বাসা থেকে রাগ করে চলে এসেছি।

কেন?

তারা আমাকে জোর করে বিয়ে দিতে চায়।

রাজি হলেই পারতে।

লোকটার বয়স আমার চেয়ে অনেক বেশি।

আচ্ছা, তুমি যে তোমার বান্ধবীর কাছে যাচ্ছে সেটা তুমি তাকে বলেছো?

না। আমার বান্ধবী শিউলি খুব ভালো। ওর উত্তর।

ঠিক আছে, তোমার বান্ধবী খুব ভালো। এখন যদি তার বাসায় কোনো সমস্যা থাকে তখন তুমি কি করবে? বললাম।

সে আবার কাদতে শুরু করলো।

কেদো না, দেখছি ব্যাপারটা। বললাম আমি।

ঢাকা এলাম। বিথীকে বললাম, চলো তোমাকে পৌছে দিই।

সিএনজি একটা ভাড়া করে রওনা হলাম। তাকে বললাম, তোমার মা বাবার কথা একবার চিন্তা করো। তাদের কি অবস্থা এখন?

আমি জানি না।

ব্যাপারটা তোমার বোঝা উচিত।

সে কিছু বললো না।

ঠিক আছে, শিউলির বাসায় যাই। তারপর দেখি কি করা যায়।

শিউলির বাসায় এলাম। শিউলিদের পরিবারের যাবার সঙ্গে পরিচিত হলাম।

শিউলিকে সব বললাম।

সে সব শুনে অবাক!

শিউলির মা – বাবার সঙ্গেও এ ব্যাপারে কথা বললাম।

তারা দুজনই খুব ভালো মানুষ।

বললাম, আংকল, সে যখন রাগ করে একা চলেই এসেছে, এখন আর তাকে একা ছাড়া যাবে না। বোঝেনই তো বর্তমান অবস্থা।

আংকল বললেন, না, না প্রশ্নই ওঠে না।

আংকল, তার বাবার কাছে ফোন করুন। বলুন, বিথী এখানে আছে। তিনি আপনার এখানে আসবেন। তারপর আপনার আলোচনা করে শেষ করবেন ব্যাপারটা। আংকল, এবার উঠি। চাচার বাসায় যাবো মানিকদিতে। বললাম আমি।

তিনি বললেন, না না, তুমি না খেয়ে যাবে না, খাওয়া–দাওয়া করে যাবে।

খেয়ে–দেয়ে আমি বিদায় নিয়ে আসার সময় আংকল আমার মোবাইল নাম্বার রাখলেন এবং বললেন আগামীকাল আবার আসতে।

তারপর বিথী ও শিউলির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম চাচার বাসায়।

পরদিন সন্ধ্যার পর আংকল ফোনে বললেন ওনার বাসায় যেতে।

গেলাম। দেখলাম বিথীর মা–বাবা দুজনেই এসেছেন।

তারা খুব অনুতপ্ত। তারা আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে খুব আদর–যত্ন করলেন। তারা সিদ্ধান্ত নিলেন এখন বীথিকে বিয়ে দেবেন না।

এরপর আমার বিদায় নেয়ার পালা। সবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বিথীকে বললাম, এ রকম পাগলামি আর করো না।

আসার সময় বিথীর বাবা– মা দুজনই খুব অনুরোধ করলেন তাদের বাড়িতে যেতে।

এখন তার পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের খুব ভালো সম্পর্ক। বিথী এখন আমার খুব ভালো একজন বন্ধুদের মধ্যে একজন। তাই আনলাকি থার্টিন আমার জীবনে *লাকি থার্টিন* হিসেবে ধরা দিয়েছে। কারণ থার্টিনের জন্যই বিথীর মতো খুব ভালো একটা বন্ধু পেয়েছি।

চৌমহনী, মৌলভীবাজার থেকে

প্রথম শিহরণ

- এস.এম ইকবাল

লম্বা ছুটিতে স্কুল বন্ধ। ভাবছি এই দিনগুলো কোথাও বেড়িয়ে আসা যাবে। খুলনা যাবো বলে মনে মনে ঠিক করলাম। ইচ্ছা থাকলেও যেতে পারছি না। কারণ তখন ক্লাস সেভেনে পড়ালেখা করছি। আমার মা কিছুতেই একা যেতে দেবেন না। আমার আব্বা, চাচা, দাদি থাকেন সেখানে।

আমার বাবা ও চাচা একই প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন। আব্বা ছিলেন খালিশপুর শিল্প ইউনিটের মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, চাচা ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।

পরক্ষণে বিধাতা যেন আমার মনের কথা শুনেছিল। আমার চাচি খুলনায় যাবেন, তার অফিস ছুটি। তিনি সরকারি ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ে চাকরি করতেন।

আমার আনন্দের শেষ নেই। উৎফুল্ল মন নিয়ে চাচির সঙ্গে খুলনার পথে পা বাড়ালাম।

পড়ালেখা করতে হয় না। পাশের রুমে বড় এক ভাই ছিলেন, তার সঙ্গে বিভিন্ন যায়গায় ঘুরছি। প্রতিদিন বিকেলে বের হতাম। বাবা, চাচা দুজনেই নেতা ছিলেন বিধায় সবাই সমীহ করতো।

হঠাৎ একদিন আমার চাচির কলিগ আলফাডাঙ্গা থেকে ফোন করলেন আগামী পরশু অফিসের জরুরি কাজে উপস্থিত হতে হবে।

আমি জানি আমারও বাড়িতে যেতে হবে। মনের মাঝে বিষণ্নতার ছাপ পড়ে গেল। রাতে ঘুম হলো না।

পরের দিন আব্বা, চাচি ও আমি তিনজনে একটি রিকশা নিয়ে দৌলতপুর এলাম। উদ্দেশ্য সেখান থেকে বাসে চড়বো। কিন্তু বিধি বাম। রাজনৈতিক দুই দলের সংঘর্ষে অনেকেই আহত হয়েছে। রাস্তার ওপর গাড়ি ভাঙার দৃশ্য। পিচঢালা পথে কাচের টুকরার স্তূপ জমে আছে। গাড়ি চলাচল বন্ধ।

চাচি বিরক্ত। তিনি ঘড়ি দেখে বললেন, লঞ্চের সময় শেষ, এখন কি করি।

আব্বা বললেন, ভাবী, হতাশ হবেন না, দেখি ট্রেনস্টেশনে গিয়ে।

আমরা আবার রিকশায় চড়ে রেলস্টেশনে গেলাম। গিয়ে দেখি লোকজন গিজ গিজ করছে। তিল ধারণের ঠাই নেই।

আমরা প্ল্যাটফর্মের একপাশে গিয়ে দাড়ালাম। সামান্য একটু জায়গা করে বসলাম।

আব্বা আমাদের রেখে টিকেট আনতে গেলেন। সেখানে বিশাল লাইন। লাইনে দাড়িয়ে দুটি টিকেট আনলেন। তাকে দেখে বুঝলাম, তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। ট্রেন আসতে আধা ঘণ্টা সময় লাগবে। একটা লোকাল ট্রেন। অপেক্ষায় আছি আমি। জীবনের প্রথম ট্রেনে চড়বো। মনের মাঝে অজানা শিহরণ। দূর থেকে টেনের হুইসল শুনে বুঝলাম ট্রেন অতি কাছে এসে গেছে।

যাত্রীদের মধ্যে ব্যস্ততা বেড়ে গেল। স্টেশনে ট্রেন থামতেই যাত্রীদের সে কি অবস্থা, কার আগে কে ওঠে!

কোনোমতে আমরা উঠলাম। ভাগ্য প্রসন্ন। ঠিক জানালার ধারে চাচি এবং আব্বা বসলেন। আমি আব্বার কোলে বসলাম।

একটু পরে ট্রেন ছাড়লো। প্রচণ্ড গরমে যাত্রীরা হাপ ছেড়ে বাচলো।

জানালার পাশে গিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছি আর ভাবছি এই ট্রেন ভ্রমণ নিয়ে কতো গল্প পড়েছি, ক্ষণিকের জন্য হলেও বাস্তবে নিজে যাচ্ছি।

হঠাৎ বাতাসের সঙ্গে ভেসে এলো দামি পারফিউমের সুবাসিত মিষ্টি ঘ্রাণ। ভেতরে উকি দিলাম। দেখলাম আমাদের বাম পাশে বসেছেন এক মহিলা। অসম্ভব সুন্দরী। চোখের পলক পড়ছে না। গায়ের রঙ কাচা

হলুদের মতো। উচ্চতায় বেশ, সুঠাম দেহের অধিকারী, চোখ দুটো হরিণীর মতো। ম্যাচ করা শাদা জর্জেটের শাড়ি পরা।

বুঝলাম তার শরীর থেকে আসছে এই মিষ্টি ঘ্রাণ। আমার দৃষ্টি আবার বাইরে গেল। গ্রাম থেকে গ্রামে ছুটে যাচ্ছে ট্রেন। কেন জানি মহিলাটিকে আবার দেখতে মন চাচ্ছে। আমার দৃষ্টি গেল। সে কি, ট্রেনের অধিকাংশ যাত্রী তার দিকে চেয়ে আছে। ব্যাপার কি? গভীরভাবে দেখলাম!

মহিলাটির বুকের ওপর তেমন কাপড় নেই। গায়ে ব্লাউজ আছে। সেটা মনে হলো হাতে বোনা। ভেতরে একটা ব্রা পরা। রঙ ছিল কালো। ফর্শা শরীরে লেপ্টে আছে। সেদিন আমার তেরো বছরের নব যৌবনের শিহরণ দেখেছি। আমি বার বার তাকে দেখি।

পাশে এক ভদ্রলোক বসা। তাদের কথায় বুঝলাম দুজন স্বামী–স্ত্রী। নব দম্পতি এবং উচ্চ শিক্ষিত।

আব্বা, চাচি সেদিন সেই দৃশ্য দেখেছিল।

এভাবে লোকাল ট্রেনটি ঝাকতে ঝাকতে যশোর এলো। আমরা নেমে গেলাম।

পথের মধ্যে হাজার পুরুষের চোখে কল্পনার ললনা হয়েছেন তিনি।

আজ আমার বয়স একুশ বছর। আমার বাবা বেচে নেই। হার্ট এটাক করেছে পাচ বছর আগে।

আজো ভুলতে পারি না আমার জীবনের একমাত্র ট্রেন ভ্রমণ, সামান্য চলার পথ। আমার ঘুমন্ত হৃদয়ে স্পন্দন হয় কল্পনার সেই দিনটি। তারিখটি মনে নেই, বছর ছিল ১৯৯৭।

আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর থেকে

হাওড়া থেকে চেন্নাই

- মোসফেকিন সালেহীন পলিন

দীর্ঘ দিন যাবৎ ইনডিয়ার চেন্নাই–এ Sankara Nethralaya-তে আমি চিকিৎসাধীন। এ জন্য হাওড়া থেকে চেন্নাই যাওয়ার এবং আসার সুযোগ হয়েছে প্রায় ছত্রিশবার। আমার প্রথম ভ্রমণের বত্রিশ ঘণ্টা সময় যা ট্রেনে কেটেছিল তার কিছু অংশ আজ তুলে ধরছি।

২৯ মে ২০০০–এ রাত আটটায় হাওড়া থেকে রওনা হবার কথা। যেহেতু এর আগে কখনো পশ্চিম বঙ্গে যাইনি, তাই হাওড়া স্টেশনকে সেদিন জাদুঘর মনে হয়েছিল যাতে বর্তমানে নতুন ও পুরনো মিলে চব্বিশটি প্ল্যাটফর্ম আছে। এর থেকে বিশ নাম্বার প্ল্যাটফর্মে হাওড়া–মাদ্রাজ মেইল পেলাম।

কিন্তু আমার নির্ধারিত আসন খুজে পেতে প্রায় এক কিলোমিটারের মতো হাটতে হলো যা ছিল প্রথম বিস্ময়। কারণ ট্রেন যে এতো লম্বা হতে পারে তা সকল বাংলাদেশিদের কল্পনাতীত।

রাতে ট্রেন যথাসময়ে ছেড়ে দিল। সেখানে ঘরমুখী প্রচুর মানুষ দেখলাম যারা খড়্গপুর থেকে কলকাতা এসে দৈনিক চাকরি করছেন। তারা অনেকেই খোলা টিকেট রিজার্ভেশন ছাড়া কেটে উঠেছেন দ্রুত খড়্গপুর পৌছার জন্য।

রাত দশটায় খড়্গপুর পৌছালো। সেখানকার যাত্রীরা নেমে গেলেন এবং বহু দূরপাল্লার যাত্রীরা ট্রেনে উঠলেন।

এখানে দেখার মতো বিষয় হলো পশ্চিম বঙ্গসহ ইনডিয়া উপমহাদেশের সবচেয়ে দীর্ঘ প্ল্যাটফর্ম এই খড়্গপুর স্টেশনে। কিন্তু রাত হওয়ায় তা ভালোভাবে বুঝলাম না। রাতে নির্ধারিত আসনে বিছানা করে শুয়ে পড়লাম। জীবনে প্রথম এতো মানুষের এক সঙ্গে রাত যাপন। এখানে বিভিন্ন বয়সের নারী, পুরুষ, শিশু–কিশোর অবস্থানরত ইনডিয়ানদের জন্য খুব স্বাভাবিক ব্যাপার হলেও আমার অনুভব ছিল ভিন্ন মাত্রায়।

খুব সকালে যখন ঘুম ভাঙলো তখন বুঝলাম কোনো এক সময় ঘুমিয়েছিলাম। দরজার সামনে মুখ ধুতে গিয়ে দেখলাম ট্রেন উড়িষ্যা দিয়ে যাচ্ছে এবং দ্রুতগতিতে পেছনে চলে যাচ্ছে সুন্দর নদী, ছোট ছোট পাহাড়, নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। কিছুক্ষণ দাড়িয়ে দাড়িয়ে তা দেখেছি। সঙ্গে কম দামের ক্যামেরা ছিল। প্রথম ভেবেছি চলমান ছবিগুলো হয়তো সুন্দর আসবে না। তবুও লোভ সংবরণ করতে না পেরে তুলতে থাকলাম অগণিত ছবি। পরবর্তীকালে দেখেছি সত্যিই কতো সুন্দর ছবি সেদিন তুলতে পেরেছিলাম।

দুপুরে প্রচণ্ড গরম অনুভব করলাম।

একজন ইনডিয়ান সহযাত্রী জানালেন, আমরা উড়িষ্যা পার করে অন্ধ্র প্রদেশে ঢুকেছি এবং এখানকার তাপমাত্রা একটু বেশি।

এখানে বেশির ভাগ খোলা প্রান্তর, শুকনো মাঠ, জনমানবহীন ও শস্যহীন শস্যক্ষেত। দেখেই মনে হয় এই অঞ্চলে পানির খুব অভাব। তবে বড় আর উচু পাহাড় বহু দূর জুড়ে। যেন দিগন্ত ছোয়া কাছাকাছি কিছু পাহাড়ের চূড়ায় আটকে পড়া মেঘ দেখলাম। আবার বেশ কিছু পাহাড়ে মানুষের বাড়িঘর ও বসবাস দেখতে পেলাম। বেশ কিছু পাহাড়ের চূড়ায় মন্দির ও গির্জা এবং কিছু পাহাড়ের পাদদেশ জুড়ে কৃশ্চিয়ানদের কবরস্থান দেখতে পেলাম। পাহাড়ের চূড়ায় মন্দির কিংবা গির্জা হলেও মানুষের পদচারণা দেখতে পেয়েছিলাম।

দুপুরে পৌছালাম বিশাখাপট্টম স্টেশনে। ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মের কিছু জায়গায় বেশ ভিড় দেখে এগিয়ে গেলাম এবং জানতে পারলাম সেখানে বিনা মূল্যে বিশুদ্ধ ঠাণ্ডা খাবার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা রয়েছে। প্রচুর মানুষ লাইন ধরে তাদের বোতলে সেই পানি পূর্ণ করে নিচ্ছিল। আজও এ ব্যাপারটি ওই দেশের রেল কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতা বলে মনে হয়।

হঠাৎ গার্ড–এর বাশি আর ট্রেনের হুইসাল শুনে দৌড়ে এসে উঠি ট্রেনে। উঠেই আশপাশের যাত্রীদের মিলিয়ে নিচ্ছিলাম। কারণ খুবই হাস্যকর, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম একজন ইনডিয়ানকে, কি ভাই, ট্রেন উল্টা চলছে কেন?

শুনে তিনি হেসেছিলেন। কিন্তু গম্ভীর জবাব, বোধহয় হাওড়া ফিরে যাচ্ছে।

তখন এক হাজার ছয়শ তেষট্টি কিলোমিটারের মধ্যে প্রায় আটশ কিলোমিটার পথ পার করে এসেছি। বাকি প্রায় অর্ধেক পথ। এর মাঝে কি এমন হলো যে, ট্রেন আবার ফিরে যাচ্ছে?

অবশ্য কিছুক্ষণ পর সমস্ত চিন্তার অবসান ঘটলো এবং বুঝতে পারলাম ট্রেন নতুন কোনো পথে যাচ্ছে। কিন্তু উল্টো পথে। আবারও নিশ্চিত হলাম ইনডিয়ার অন্য সহযাত্রীদের জিজ্ঞাসা করে। এরপর এক এক করে পার হতে থাকলাম রাজা মুণ্ডরি, ভিজয়ওয়াডা, ইলুরুসহ জানা–অজানা বহু স্টেশন।

এর মধ্যে হঠাৎ চোখে পড়লো বিশাল এক নদী, নাম গোদাবরি। ধীর গতিতে ট্রেন বৃজ পার হচ্ছিল। হঠাৎ জানতে পারলাম মাথার উপর দিয়ে ছুটে চলছে শ শ ব্যস্ততম যানবাহন। আসলে বৃজটি ছিল দোতলা যার নিচ দিয়ে রেল পারাপার ও উপর দিয়ে অন্যান্য যানবাহন। এই রুটে পরবর্তীকালে ভ্রমণে গেলে অবশ্যই লক্ষ্য করবেন ব্যাপারটা। আরো লক্ষ্য করার মতো বিষয়, এই রেললাইন বহু ব্যস্ততম শহরের প্রাণকেন্দ্র স্পর্শ করেছে। কিন্তু যে সমস্ত জায়গায় রাস্তা রয়েছে সেখানে এমন বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে যাতে ট্রেন চলাচল বা রাস্তার যানবাহন চলাচলে কোনো বিরতির প্রয়োজন পড়ে না।

যেতে যেতে আবার রাত হয়ে গেল। রাতে শোবার আগে ট্রেনে অর্ডার করা খাবার দিয়ে গেল যা খাওয়া রীতিমতো কষ্টসাধ্য ছিল আমার জন্য। কারণ খাবারে টক–এর প্রাধান্য এতো বেশি যা মাত্রা অতিরিক্ত মনে হয়েছেল। আবার তার সঙ্গে দিয়েছিল টক দই।

পরদিন সকাল সাড়ে পাচটায় অর্থাৎ ৩১ মে ২০০০–এর শেষ পর্যন্ত পৌছালাম চেন্নাই সেন্ট্রাল স্টেশনে। এবার শেষ বিস্ময়! যা ওঠার সময় বুঝতে পারিনি তা হলো, একই ট্রেনে আমরা সব মিলিয়ে দেড় হাজারের বেশি

মানুষ চেন্নাই পৌছালাম। দীর্ঘ যাত্রার যাত্রীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ পর আবার সারা জীবনের জন্য আলাদা হয়ে যাবো ভেবেই কাছের কিছু যাত্রীর কাছে আমার ঠিকানা সংবলিত কার্ড দিয়ে বিদায় নিলাম।

মিরপুর, ঢাকা থেকে
zeal_pol@yahoo.com

সমান্তরাল

- মোহাম্মদ আলমগীর লাবু

হঠাৎই চমকে উঠলাম। এ যেন সুবোধ ঘোষের *জতুগৃহ*–এর মতো আমাদের মিলন কিংবা ফকির আলমগীরের বিখ্যাত গান –

শান্তাহার জাংশনে
দেখা হলো দুইজনে।

এ রকমই দেখা হলো তার সঙ্গে আমার। তবে শান্তাহার জংশনে নয়, কমলাপুর স্টেশনে। হার্টবিট মিস করলাম। তার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। থাকার কথাও নয়। আমি একা। সে একা নয়, দুজন। তারা দুজন। বোধহয় তার স্বামী। হ্যা, স্বামীই।

বিয়ের পর একবার মাত্র দেখেছিলাম। আজ সেই ভদ্রলোককে আবার দেখলাম। গম্ভীর লোক। স্বামীরা বোধহয় স্ত্রী নিয়ে বের হলে একটু গম্ভীরই হয়। কি জানি? তার সঙ্গে কথা বলি না। তিনি তো বলবেনই না।

আমি যাবো চট্টগ্রাম। সেখান থেকে কক্সবাজার। একটা বেভারেজ কম্পানিতে ঢুকেছি। আমার প্রমোশন। এরিয়া হলো কক্সবাজার। উদ্দেশ্য সেখানে।

তারা যাচ্ছে কোথায়? চট্টগ্রাম, নাকি অন্য কোথাও? কৌতূহল হলো। নিজেকে সামলালাম। কথায় বুঝলাম কক্সবাজার।

টিকেট আগেই করা ছিল। *তূর্ণা নিশিথা*–য় চড়লাম। কম্পার্টমেন্টে ঢুকে আবার হার্টবিট মিস করলাম। ওরা দুজন!

এ যেন নিয়তি আমাকে নিয়ে খেলছে। ভাবলাম নেমে যাবো। তার সঙ্গে একই রুমে সারা রাত থাকতে পারবো না। চোখে চোখ পড়বেই। কি বলবো? বলা কি ঠিক হবে? কিন্তু চাকরিও আমার জরুরি। না গেলেই নয়।

উঠে বসলাম। তারা বসলো আমার সামনের সিটে মুখোমুখি। ফার্স্ট ক্লাস রুমে আরো দুই তিনজন। তবুও স্থির হতে পারলাম না। ওকি দেখেছে? নিশ্চয় দেখেছে।

সাথী হঠাৎ অবাক কাজ করলো। সকলের সামনে তার স্বামীকে সে চুমু খেল। ভদ্রলোক দারুণ বিরক্তি ও অস্বস্তিতে পড়লেন। রাগী মুখ করে তার দিকে তাকালেন। কিন্তু সাথী হাস্যোজ্জ্বল।

আমি জানি সাথী কেন এমন করলো। সে আমাকে দেখিয়ে দিল। তার ঠোটের সেই বিজয়ী হাসি তাই বলে। ওই হাসিটি বহুদিন ধরে চিনি।

রাতের অন্ধকার চিরে ট্রেন চলছে। জাগ্রত আমি। ঘুমন্ত স্বামীকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মুখ ঘষছে, আদর করছে। বেহায়া আমি তাকাবো না করে তাকিয়ে যাই। কেন তাকাই জানি না। অন্য যাত্রীরাও হ্যাংলার মতো তাকায় আর হাসে।

সাধারণত দেশের রক্ষণশীল ঘরের মেয়েরা এ ধরনের ব্যবহারে রাজি নয়। কিন্তু সাথী আজ যেন সমস্ত খোলামেলা। পারলে স্বামী সঙ্গম করে দেখিয়ে দিতে চায়। দেখো আমি কতো সুখে আছি।

অন্ধকারে মুখ লুকাই। ট্রেনের পাথর ভাঙা শব্দের সঙ্গে আমিও ভেঙে যাই। তারা সুখে থাকুক তা চেয়েছিলাম। কিন্তু তার এতো সুখ আমাকে হিংসা দেয়। কেন দেয়? আজ তার স্বামীর জায়গায় আমিও তো থাকতে পারতাম। কেন হলো না?

সে এক বিরাট ইতিহাস। ঐতিহাসিক নয়। ক্লাস টেন–এ পড়া অবস্থায় আমাদের পাড়ায় তাদের আগমন। প্রথম প্রথম পাত্তা না দিলেও ক্রমেই কেন জানি তার প্রতি আকৃষ্ট হলাম। অনেক প্রতিশ্রুতি, অনুনয়, এরপর আমাদের ভালোবাসার পথ চলা।

তার বাবা বেবিট্যাকসি চালক। অনেক কষ্টের সংসার। সাথীর ভয় সেখানে। পাছে যদি তাকে ফেলে সটকে পড়ি! অভয় দিই। আমি নায়ক, ভিলেইন নই। সমাজকে এক হাত নেয়ার ক্ষমতা আছে।

তার ইচ্ছা ছিল সমুদ্র দেখবে।

বলেছিলাম, তোমাকে সমুদ্র দেখাবো। তার খুব শখ ছিল রাতের ট্রেনে চড়বে। নিস্তব্ধ রাতের ট্রেনের ঝকঝক শব্দে ঘুমন্ত পরিবেশে পূর্ণিমা রাতে জ্যোৎস্না দেখবে। পরী হয়ে যাবে সে।

তাকে সেই স্বপ্ন দেখার সাহস যোগালাম। কিন্তু হলো উল্টো।

পরিবার থেকে এলো প্রচণ্ড বাধা। একজন বেবিট্যাকসি চালকের মেয়েকে বিয়ে করা যাবে না।

কেন যাবে না?

উত্তর, সমাজে মুখ দেখাবো কি করে!

আমার পরাজয় হলো।

নায়ক হতে পারলাম না।

ভিলেইন হওয়ার যোগ্যতাও নেই।

হিজড়া হয়ে গেলাম।

পরিবারের সিদ্ধান্তে প্রবাসীর কন্যাকে বিয়ে করলাম। তাকে দেখা দিইনি। কিভাবে দেবো? আমি যে, আমার পরিবারের সমাজ বাচাতে চেয়েছি।

তারা সেই সমাজ ছেড়ে চলে গেল অন্য কোথাও। তবুও কিসের আকর্ষণে সেই সমাজে উকি দিতাম।

তার বিয়ে হলো, দেখলাম।

চলে গেল, দেখলাম।

ঘরে ফিরলাম।

বিয়ের এতো দিন পরে কি সাথী তার সেই সমুদ্র দেখার শখ এবং ট্রেনে জ্যোৎস্না দেখার স্বাদ পূরণ করতে চলেছে? নাকি নিয়তির শাস্তি আমায় টেনে এনেছে এই যাত্রাপথে জানি না।

সারা রাত চাদ দেখলাম। তারপরই দেখলাম না। তবুও জেনে খুশি হয়েছি, এতো দিনে সত্যিকার বিশ্বস্ত কাউকে পেয়েছে যাকে তার শখের কথা দ্বিতীয়বার বলে। ধন্যবাদ তাকে যে তার তার শখকে সে পূরণ করেছে। আমার মতো কাপুরুষ হয়ে সে পালায়নি।

নির্ধারিত স্টেশন এসে নেমে গেলাম। ইচ্ছা করে হারিয়ে গেলাম ভিড়ে। কক্সবাজার যাবার তারিখ পাল্টে একটি শস্তা হোটেলে উঠলাম। দুই দিন পর যাবো। যদি আবার বাসে তাদের সঙ্গে দেখা হয়!

বিকেলবেলা রেললাইনের পাশে এসে বসলাম। এই রেললাইন ধরেই আমরা এসেছি। কিন্তু সম্পর্ক রেললাইনের মতো সমান্তরাল। দুজন দুই ভুবনের দুই বাসিন্দা। যাদের মধ্যে কোনোদিন আর মিল হবে না। কোনোদিনই না।

মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে

ঝমাঝম

- শাহী সুরমা

রেলগাড়ি ঝমাঝম, পা পিছলে আলুর দম এই চরণটি ছোটবেলায় অনেকবার পড়তাম। আলুর দমই বলি আর ঘণ্টই বলি খেতে গেলে এই চরণটি একবার হলেও মুখে আনতে হতো।

আমাদের এলাকায় মানে জেলায় কোনো ট্রেন লাইন নেই। ট্রেন দেখতে হলে কালীগঞ্জ যেতে হয় আর চড়তে হলে কুষ্টিয়ার পোড়াদহে যেতে হয়। ষোল বছর বয়স পর্যন্ত ট্রেনে ওঠা ছিল আমার কাছে স্বপ্নের মতো।

হঠাৎ-ই আব্বা বদলি হয়ে গেলেন কুমিল্লা। প্রতিদিন ট্রেনের শব্দ আর মাটি কাপার শব্দে প্রায়ই ঘুম হারাম হয়ে যেতো। আব্বার একবার মিটিং পড়লো সিলেটে। আমরা সপরিবারে সে বছর ট্রেনে ওঠার অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম।

রাত এগারোটায় কুমিল্লা থেকে সিলেট যাবে আমাদের ট্রেন। এটা ১৯৯৮ সালের ঘটনা। কিন্তু আখাউড়া পর্যন্ত আমরা কোনো সিট খুজে পাচ্ছিলাম না। এক সময় সবাই যখন বসলাম, হঠাৎ দেখা গেল আব্বার পকেটমার হয়ে গেছে। ভাগ্যিস সে সময় আম্মার কাছে টাকা ছিল।

দ্বিতীয়বার যখন কুমিল্লা থেকে সিলেট গেলাম, আখাউড়া স্টেশনে ট্রেন পৌছাতেই জানালা দিয়ে কে যেন এক টুকরা আগুনসহ সিগারেটের শেষ অংশটুকু আমার কোলের ওপর ফেলেছিল। হাতটা একটু পুড়ে গিয়েছিল। দাগটা এখনো হাতে রয়ে গেছে।

জনির সঙ্গে বিয়ের পর আমরা যখন সিলেট গেলাম, দুইজন ট্রেনে বসে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, প্রতি ছয় মাস অন্তর আমরা ট্রেনে করে সিলেট অথবা চিটাগাং যাবো। আমার সঙ্গে বিয়ের আগে জনি যতোবার চিটাগাং গিয়েছে, ওর শুধু ডানপাশে সিট পড়তো। কিন্তু এবার সিলেট যাওয়াতেই ওর সিট শুধু বামপাশে পড়লো।

ও ইনডিয়া গিয়ে কিভাবে ট্রেন দেখেছে, তাদের ভদ্রতা, সভ্যতা সবই বর্ণনা করলো। এরপর আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। সারা পথ ওর কাধেই মাথা রেখে ঘুমালাম। সত্যিই সে স্মৃতি ভোলার নয়।

একটা বইয়ে পড়েছিলাম, প্রথম যখন সিলেটে ট্রেনলাইন স্থাপিত হয় তখন *মিল্কি* নামে একজন বাঈজি ছিল। সে আবার যার-তার সঙ্গে রাত কাটাতো না।

ট্রেনলাইন তৈরির জন্য কিছু বৃটিশ ইঞ্জিনিয়ার এসেছিল। মিল্কি বাইজির জন্য এদের মধ্যে একজন বৃটিশ পাগল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একজন স্থানীয় খুব খারাপ লোক মিল্কিকে কিনে রাখতে চেয়েছিল। একদিন রাতে ওই লোক আসে মিল্কির ঘরে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মিল্কি তাকে খুন করে বৃটিশ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে পালিয়ে যায়। মিল্কির থাকার জায়গা ছিল স্টেশন মাস্টারেরই কোনো এক ছোট বিল্ডিংয়ে।

যাই হোক, সেদিন মিল্কির ভাগ্যে কি ঘটেছিল তা জানি না। তবে ট্রেনে বসে আমি আর জনি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তা আর পরে রাখা হয়নি। কারণ আমাদের ডিভোর্স হয়ে গিয়েছিল।

গত রোজার ঈদে হঠাৎই ভাইয়ার সঙ্গে সিলেট চলে গেলাম মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে। কমলাপুর স্টেশনে গিয়ে র‌্যাব দেখে মনটা কাপতে লাগলো।

অবশেষে ট্রেন ছাড়লো। আমার সারা পথ মনে হতে লাগলো, আমরা হাটলেও হয়তো ট্রেনের আগে সিলেটে গিয়ে পৌছাতাম। ট্রেন যখন আখাউড়া পৌছালো, হঠাৎ এক পাগল একটি আংটি ভাইয়ার হাতে জোর করে পরিয়ে দিলে পাচশ টাকা দাবি করলো এবং আংটি খুলতে নিষেধ করলো।

অবশেষে পাগলটাকে বিশ টাকা দিয়ে বিদায় দিলাম।

ভাইয়া আংটি খুলতে গেলে সবাই বাধা দিল ও বলতে লাগলো, এটা আপনার খুব উপকারে আসবে। একজন তো বলেই ফেললো, তার কোনো আত্মীয় নাকি একবার এই রকম এক পাগলের হাতে পড়েছিল ট্রেনের

ভেতর। তাকে এক দলা মাটি দিয়েছিল। পরদিন বাড়ি গিয়ে সে দেখে যে, একটা খুব দামি পাথর হয়ে উঠেছে ওই মাটি।

অনেক দিন পরে ভাইয়াকে জিজ্ঞাসা করেছিলা, আংটি কই?

ভাইয়া জানালেন, আংটিতে উপকারের চেয়ে অপকারই নাকি বেশি হয়েছে। তাই ওটা ফেলে দিয়েছেন তিনি।

আমরা সিলেট গিয়েই টিকেট কাটলাম পরদিন রাত দশটার ট্রেনে। এক ও দুই নাম্বার সিট হলো আমাদের। পরদিন যখন ট্রেনে উঠলাম, আমরা সিট খুজে পাচ্ছিলাম না। অনেক খোজার পরে দেখলাম বাথরুমের সামনের সিট দুটো আমাদের। কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিলাম। একে তো আমি খুব অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলাম, তার ওপর এতো বড়ো একটা জার্নিতে বাথরুমের গন্ধ। উহ! ভাবতেই পারছিলাম না।

দুইজন বাবুর্চি ঢাকা থেকে সিলেট গিয়েছিল রান্না করতে। তারা আমাদেরকে তাদের সিট দুটো ছেড়ে দিল। এবং বললো, আমার বোন বা মা আপনি হতে পারতেন। তাই আপনার প্রতি সম্মান রাখা আমাদের কর্তব্য।

সেই বগিতে অনেক ভদ্রলোকই ছিল সুট-টাই পরা। কিন্তু কেউ-ই আমাদের প্রতি ন্যূনতম সৌজন্যতা বোধও সেদিন দেখায়নি। আমার চোখে পানি এসে গিয়েছিল শুধু এটা ভেবে যে, এখনো চলাফেরা করতে গেলে কিছু পুরুষ মানুষ বাইরের মহিলাদের তাদের নিজের মা-বোন মনে করে।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

লিপস্টিক

- এস সোহেল আহম্মেদ

বছর তিনেক আগের এক জুলাইয়ে। ঢাকা থেকে ময়মনসিংহে যাওয়ার জন্য ভোর সাতটায় কমলাপুর রেল জাংশন থেকে আন্তনগর ট্রেনের টিকিট যোগাড় করি। ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার আরো আধা ঘণ্টা আছে। পাশের দোকান থেকে চা খাওয়ার সময়ে হকারকে ডেকে একটি পেপার নিলাম।

একটু পরে রেল জাংশনে ঝুলিয়ে রাখা মাইকে জানিয়ে দিচ্ছে ট্রেন ছাড়ার আর মাত্র পাচ মিনিট আছে।

দেরি না করে (গ) ৩৮ নাম্বার সিট খুজতে গিয়ে দেখলাম আমার সিটের ঠিক পাশের সিটে বসা সুন্দরী একটি মেয়ে। পরনে হালকা গোলাপি থ্ পিস। চোখে কালো সানগ্লাস এবং হাতে সুন্দর একটা মোবাইল সেট।

সামনে গিয়ে বিনয়ের সঙ্গে সাইড চাওয়ামাত্রই আমাকে আমার সিটে যাওয়ার সাইড সে দিল।

আমার সিটটা ছিল জানালার পাশে। আমার সিটে বসে মনোযোগ সহকারে পেপার পড়া শুরু করলাম। ট্রেন তার আপন গতিতে ঝক ঝক করতে করতে রওনা হলো। দেখলাম আমার পাশের সিটে বসা মেয়েটা চুপ করে কি যেন ভাবছে।

পেপার রেখে মেয়েটার দিকে তাকালাম। ভাবলাম মেয়েটার সঙ্গে কথা বলবো, পরিচয় নেবো। আবার এটাও ভাবলাম যদি কিছু সে মনে করে!

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটার হাতে রাখা মোবাইলে একটা ফোন এলো। রিসিভ করলো। কিন্তু চলন্ত ট্রেন নেটওয়ার্কের সমস্যার জন্য কোনো কথাই বলতে পারলো না। একটু পরে আবার ফোন এলো। ঠিক একই সমস্যা। এমন করে পাচ ছয়বার কল এলো, রিসিভ করলো। কথা হলো না।

আমার খুব হাসি পাচ্ছিল। এমন সময় আবার বেজে উঠলো ফোন। সঙ্গে সঙ্গে রিসিভ করে, হ্যালো কে, হ্যালো বলতে বলতে জানালার পাশে এসে দাড়ালো।

মেয়েটা বুঝতে পারলো জানালার বাইরে ছাড়া কথা বলা সম্ভব নয়। সে ঠিক তাই করলো। তার শরীরের উপরের অংশটা জানালা দিয়ে বের করে আপন মনে কথা বলে চললো।

এদিকে মেয়েটার জামা থেকে ভেসে আসা সুগন্ধে আমাকে মাতোয়ারা করে তুললো। আস্তে আস্তে তার পুরো শরীরটা আমার শরীরের সঙ্গে যে লেগে যাচ্ছিল সেদিকে তার কোনো খেয়াল নেই।

মাথা নিচু করে চুপ করে বসে থাকলাম। প্রায় দশ মিনিট পরে মেয়েটা নিজের সিটে ফিরে গেল আর বসে বললো, আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্য দুঃখিত।

বললাম, না, আমার কোনো কষ্ট হয়নি। তাছাড়া আপনি তো কথা বলতে পারলেন। আপনার নামটা জানতে পারি কি?

ইভা।

খুব সুন্দর নাম।

ধন্যবাদ।

তুমি কোথায় যাবে? তাকে তুমি করেই এবার বললাম। মনে হলো সে বছর দুয়েক ছোট।

আমার বাড়ি ময়মনসিংহ। ঢাকায় বড় মামার বাসায় গিয়েছিলাম। লেখাপড়া নিশ্চয় করেন?

হ্যা, এইচএসসি সেকেন্ড ইয়ারে।

তারপর একে একে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, আমিও ইভার প্রতিটি কথার একটা একটা উত্তর দিলাম।

অনেক কথা হয়ে গেল ইভার সঙ্গে। জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছিলাম।

হঠাৎ পাশ ফিরে দেখলাম ইভা ঘুমিয়ে পড়েছে। ইভার ফর্শা সুন্দর হাতটা আমার কাধের ওপর। তার প্রায় পুরো শরীরটা আমার শরীরের সঙ্গে লাগানো।

বাইরের ঝির ঝির হাওয়া আসছিল আর ট্রেনের ঝক ঝক শব্দে আমারও চোখে ঘুম এলো। আমিও ঘুমিয়ে গেলাম। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা পরে ইভার মোবাইলে মিসকলে হঠাৎ দুজনের ঘুম ভেঙে গেল।

প্রচণ্ড ঘুমের ঘোরে কখন যে ইভার ঠোট দুটো আমার গালের সঙ্গে মিলে গেল তা কেউ খেয়াল করিনি। ঘুম ভাঙতেই আমার দিকে তাকিয়ে ইভা হাসছে।

ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না যে, ইভার ঠোটের লিপস্টিক আমার গালে লেগে আছে।

পাশে রাখা ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা আয়না ইভা আমাকে দিয়ে বললো, চেহারাটা একটু দেখেন তো। আয়নাটা সামনে ধরেই আমি তো অবাক! ইভার দিকে তাকিয়ে দেখলাম ইভা লজ্জায় লাল হয়ে গেছে। ওর দিকে তাকিয়ে হাসি পেল। হেসে ফেললাম।

ইভাও তার হাসি ধরে রাখতে পারলো না।

সেও আমার সঙ্গে হাসিতে যোগ দিল। বেশ কিছুক্ষণ হাসাহাসির পর ইভা তার ওড়না দিয়ে আমার গালের লিপস্টিক মুছে দিচ্ছে। তখন পলকহীন দৃষ্টি দিয়ে ইভাকে দেখছিলাম।

ট্রেন গন্তব্যে এসে থামলো।

ইভা আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তড়িঘড়ি করে নেমে গেল ট্রেন থেকে।

আমিও আমার ব্যাগ নিয়ে নামার সময় দেখি ইভার সিটে তার কালো সানগ্লাসটা রেখে গেছে। গ্লাসটা নিয়ে তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে ভিড়ের চাপে আর তাড়াতাড়ি নামতে পারিনি।

কিছুক্ষণ পর নেমে দেখি ইভা চলে গেছে। তারপর গ্লাসটা নিয়ে চলে আসি।

এখনো আমার ওই ভ্রমণের কথা মনে পড়লে প্রচণ্ড হাসি লাগে। তখন ড্রেসিংটেবিলের সামনে দাড়িয়ে লিপিস্টিক লাগা গালটা দেখি। ইভার সানগ্লাসটা ওই ভ্রমণের সাক্ষী হয়ে আজো আমার কাছে আছে।

জয়দেবপুর, গাজীপুর থেকে

টয়লেট সঙ্কট

– রানা জামান

ছেলেবেলায় ট্রেনের *ঝিকঝিক কুউউ* শব্দে পশ্চিম দিকে উৎসুক চোখে তাকাতাম। তখন নয় কিলোমিটার দূর থেকেও ট্রেনের হুইসল শোনা যেতো। কিন্তু ট্রেন দেখতে যেতে পারিনি বা ট্রেনে চড়তে পারিনি। একমাত্র তাড়াইল–নান্দাইল রাস্তা কাচা ও প্রচুর খানাখন্দ থাকায় যাওয়া হয়নি। কালের চাকার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজে ভর্তি হলেও ট্রেনে চড়া হয়ে ওঠেনি। তবে কলেজে পড়াকালে রেললাইনের পাশ ধরে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হেটেছি এবং রেললাইনে কান ঠেকিয়ে ট্রেন আসার শব্দ শোনার চেষ্টা করেছি।

১৯৮০ সালে কলেজ পাস করে বাড়ি এলাম। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। একদিন খুব ভোরে মা–বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ব্যাগ কাধে ঝুলিয়ে তাড়াইল–নান্দাইল রাস্তায় নামলাম। কাচা রাস্তা। রিকশা চলাচল ছিল না। আট জায়গায় পানি চলাচলের জন্য কাটা। কোনো সাকো নেই। তিনটি কাপড় গুটিয়ে, দুটো গামছা ভিজিয়ে এবং বাকিগুলো খেয়ায় পারাপার হয়ে পৌনে আটটায় নান্দাইল রেলস্টেশনে পৌছালাম। প্ল্যাটফর্মের এক কোণে আড়াল নিয়ে পেন্ট পরলাম। ভিজা গামছা বেড়ায় নেড়ে দিলাম। ব্যাগ কাধে ঝুলিয়ে কাউন্টারে গিয়ে টিকেট সংগ্রহ করলাম। ভৈরব পর্যন্ত।

ট্রেনের শেডিউল সকাল আটটা, তখনো কোনো খবর ছিল না। জানা গেল ময়মনসিংহ থেকে ছাড়ার পর গৌরিপুর জাংশনে ফেলে রাখা হয়েছে। ভৈরব থেকে ছেড়ে একটি গুডস ট্রেন কিশোরগঞ্জ অতিক্রম করছিল। ওটা গৌরিপুর পৌছালে লোকাল ট্রেনটা আসবে।

আগের জায়গায় ফিরে গামছাটা না পেয়ে বুকে একটা ধাক্কা খেলাম। গামছাটা গেল কোথায়? আশপাশে লোকদের জিজ্ঞাসা করেও গামছা না পাওয়ায় মনটা বেশ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সে সময় ট্রেনের শব্দে দক্ষিণে তাকিয়ে দেখলাম গুডস ট্রেন আসছে গদাইলস্করি চালে। ট্রেন প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করার সময়ে বগি গুণলাম। মোট ১৬০টি।

গুডস ট্রেন চোখের আড়ারে চলে যেতেই ব্যাগ থেকে নাস্তার পোটলা বের করলাম। মা পিঠা বানিয়ে দিয়েছিলেন। গুলি পিঠা, সঙ্গে আখের গুড়। গুড় দিয়ে তিনটা পিঠা খেয়ে বাকিগুলো ব্যাগে রেখে টিউবওয়েলের পানি খেলাম। অতঃপর অপেক্ষা।

প্ল্যাটফর্মের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত পায়চারি করতে থাকলাম। মাঝে মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্যানভাসারদের ক্যানভাস শুনছিলাম। একজন ক্যানভাসার হালুয়া বিক্রি করছিল। বিভিন্ন রঙের হালুয়া। খুব সুগন্ধ। সকল রোগের মহৌষধ।

ক্যানভাসার ক্যানভাস করার ফাকে ফাকে বলছিল, পকেটমার থেকে সাবধান!

হঠাৎ একজন বলে উঠলো, হায় হায়! পকেটমার আমার পকেট কেটে নিয়ে গেছে!

লোকটি কাদতে থাকলো। লোকজনের সঙ্গে আমিও সেদিকে গেলাম। পকেটমার ভদ্রলোকের শার্টের ভেতরের বুক পকেট নিপুণভাবে কেটে টাকা নিয়ে গেছে। আমার পকেট কাটার আশঙ্কা ছিল না। কারণ আমার টাকা ছিল ব্যাগের ভেতরে। আমার তেমন কোনো অসুখ না থাকায় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ধন্বন্তরি হালুয়া কিনতে পারলাম না। একটা চিৎকার শুনে উত্তরে তাকিয়ে দেখলাম এক ক্যানভাসার একটা সাপ গলায় ঝুলিয়ে লোকজন ডাকছে।

অন্য ক্যানভাসারদের ফেলে লোকজন সেদিকে ছুটে চললো।

আমিও গেলাম।

লোকটির কাছে পাচটি ঝাপি।

ক্যানভাসার গলা থেকে সাপটি ফ্লোরে রাখতেই ফণা তুলে দাড়ালো।

ক্যানভাসার প্রত্যয়ের সঙ্গে বললো, তুই আমাকে কামড়াতে চাস? পারবি না। তোর বিষদাত আমার কিছুই করতে পারবে না। আমার জাদুর ডাল দেখলেই তোর ফণা নেমে যাবে। ক্যানভাসার ডান হাত অর্ধমুঠোবদ্ধ করে সাপের ফণার সামনে নিয়ে নাচিয়ে সুর করে বললো, *খা খা খা বকখিলারে খা! সতিনরে খা*!

সাপটি ছোবল দিতেই ক্যানভাসার হাত সরিয়ে পাশে রাখা একটি আকাবাকা লাঠি হাতে তুলে নিল।

সাপটি ফণা তুলে দাড়িয়ে।

ক্যানভাসার লাঠিটা সামনে ধরতেই সাপটি ফণা নামিয়ে খাচায় ঢুকতে শুরু করলো।

সাপটি পুরোপুরি খাচায় ঢোকার পর কন্যাভাসার লাঠিটা সবাইকে দেখিয়ে বললো, দেখেছেন, গাছের কি গুণ! এই কাঠ শরীরে থাকলে সাপ যতোই বিষধরই হোক না কেন, কামড়াতে পারবে না। ভাইসাব, আমাদের দেশের লতাপাতার অনেক গুণ। চিনতে পারলে অমূল্য, আর না চিনতে পারলে পথের ধুলা।

ব্যাগ আকড়ে সাপের খেলা দেখছিলাম। ক্যানভাসারের কথায় মুগ্ধ হয়ে একটা তাবিজ কিনে তখনই গলায় ঝুলিয়ে নিলাম।

সাপের খেলা শেষ হলেও ট্রেন আসেনি। দশটা পচিশে ট্রেনের হুইসালে প্ল্যাটফর্মের উত্তরে সবাই তাকালাম। ট্রেনের ইঞ্জিন দেখা যাচ্ছিল। আস্তে আস্তে ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকলো। শুরু হলো যাত্রীদের ছোটাছুটি। যাত্রীদের নামতে না দিয়েই ওঠার প্রচেষ্টা।

যুদ্ধ করেও ট্রেনে উঠতে পারলাম না।

যাত্রী পুরো না উঠতেই ট্রেন চলতে শুরু করলো।

ট্রেনে উঠতে না পারায় ফুপিয়ে উঠলাম। সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে ট্রেনের সঙ্গে দৌড়াতে শুরু করলাম।

একজন সহৃদয় ব্যক্তি আমার হাত ধরে টেনে ট্রেনে তুলে ভেতরে ঠেলে দিলেন।

ভেতরে গাদাগাদি অবস্থা। সিট পাওয়ার প্রশ্নই আসে না। সেখানে দাড়িয়ে দরদর করে ঘামছিলাম। মাঝে মধ্যে যাত্রীদের ধাক্কায় এদিক–সেদিক সরছিলাম। পায়ে অন্যের মাড়িয়ে দেয়ার ব্যথা নীরবে সহ্য করছিলাম। কিন্তু আমি সহ্য করলেও অন্যে সহ্য করবে কেন!

একজন চেচিয়ে উঠলেন, কে আমার পায়ে পাড়া দিল? আরেকবার পাড়া দিলে ঠ্যাং ভেঙে হাতে ধরিয়ে দেবো!

কানের কাছে আরেকজন বললেন, এমন গাদাগাদি অবস্থায় পায়ে পাড়া পড়বেই। এ নিয়ে মাথা গরম করবেন না ভাই।

ট্রেন কিশোরগঞ্জ পৌছালে অফিসের যাত্রীরা নামলে হালকা হয়ে যাবে।

পরবর্তী স্টেশন নীলগঞ্জ। ট্রেন থামলে যাত্রী নামার চেয়ে উঠলো বেশি। ট্রেন চলতে শুরু করলো। আমার প্রস্রাব পেয়ে গেল।

আমি নড়েচড়ে উঠতেই ঘাড়ের কাছের জন ধমকে উঠলেন, এই ছেলে, নড়ছো কেন?

সবিনয়ে বললাম, আমার প্রস্রাব চেপেছে। বাথরুমে যাবো।

এই ভিড়ের মধ্যে বাথরুমে যাবে কিভাবে? ভৈরব নেমে প্রস্রাব করো!

খুব জোরে প্রস্রাব চেপেছে যে।

কি মুশকিল।

আরেকজন জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে ভাইসাব?

ট্রেনে দাড়ানোর জায়গা নেই। এই ছেলে বাথরুমে যেতে চায়।

প্রস্রাব পায়খানা আটকে রাখা যায় না ভাইসাব। ছেলেটাকে বাথরুমে যেতে দিন।

এ ওর পা মাড়িয়ে বাথরুম পর্যন্ত এসে থমকে গেলাম। বাথরুমের ভেতরেও গাদাগাদি অবস্থা। বাথরুমের একজন জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাও ভাতিজা?

জড়িত কণ্ঠে বললাম, প্রস্রাব করবো।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠলেন।

তার সঙ্গে অন্যরাও হাসতে লাগলো।

ওদের হাসি হজম করে ফের বললাম, খুব প্রস্রাব পেয়েছে।

বাথরুমে একজন ভদ্রমহিলা ছিলেন। তিনি সহানুভূতিমাখা কণ্ঠে বললেন, আহারে বেচারা! প্রস্রাব আটকে রাখতে ওর খুব কষ্ট হচ্ছে। ও ভেতরে ঢুকে প্রস্রাব করে চলে যাক।

সেই লোকটি বললেন, তুমি ভেতরে ঢুকে প্রস্রাব করো ভাতিজা। আমরা চোখ বন্ধ করে রাখবো। হাঃ হাঃ হাঃ ...!

লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে মানুষ বিলি কেটে ভেতরে ঢুকলাম। ওরা চোখ বুজে ছিল কি না জানি না। তবে আমি চোখ বুজে কোনোমতে দাড়িয়ে প্রস্রাব সেরে বাইরে চলে এলাম।

কিশোরগঞ্জ রেলস্টেশনে প্রচুর যাত্রী নামলেও সমান সংখ্যক যাত্রী উঠলো। যশোদল রেলস্টেশনে ট্রেন খুটি গেড়ে দাড়ালো। চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা বাহাদুরাবাদ মেল ট্রেনকে পাস দেয়ার জন্যই আমাদেরটা থেমেছিল। মেল ট্রেন পাস হবার পর আমাদের ট্রেন ছাড়লো।

সারা দিন ধুকতে ধুকতে সন্ধ্যার পর ট্রেন ভৈরব জংশনে পৌছলো। বগি ছেড়ে ইঞ্জিন চলে গেল। সব যাত্রী নেমে যাওয়ায় ট্রেন খালি।

ঢাকা মেলের টিকেট কেটে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে করতে ট্রেনের অপেক্ষা করছিলাম।

রাত দশটায় ঢাকা মেল এলে তাতে চড়লাম। সিট পাওয়া গেল। গুড় দিয়ে পিঠা খেয়ে আশপাশে তাকিয়ে সহযাত্রীদের ঘুমুতে দেখে আমারও ঘুম পেয়ে গেল। আমি জুতা খুলে, ল্যাশ গলায় জুলিয়ে, ব্যাগ দুই হাতে জড়িয়ে ঘুমিয়ে গেলাম।

কুলির ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙলে বুঝতে পারলাম ট্রেন কমলাপুর রেলস্টেশনে পৌছেছে। সিটের নিচে তাকিয়ে জুতো দেখতে না পেয়ে হার্টবিট বেড়ে গেল। পাগলের মতো সিটের নিচে তন্ন তন্ন করে খুজেও জুতো পেলাম না। অগত্যা খালি পায়ে ঢাকার মাটিতে প্রথম পদক্ষেপ রাখলাম।

বাবুরহাট, চাদরপুর থেকে

ভিয়েনা টু ওয়ারসো

- মোহসীন ভূঞা

সুডবাহনহফ স্টেশনে এসে দেখি ট্রেন ছেড়ে যেতে আরো দশ মিনিট বাকি। তেমন লোকজন নেই সম্ভবত সপ্তাহের মাঝামাঝি হওয়ায়। নির্দিষ্ট কম্পার্টমেন্টে এসে লাগেজ রেখে সিট মিলিয়ে বসি। প্রত্যেক বগি দুটি অংশে ভাগ করে প্রতিটাতে চারজন করে বসার ব্যবস্থা। একপাশে লম্বা করিডোর।

ঠিক সোয়া চারটায় গার্ডের হুইসলের সঙ্গে ট্রেন নড়েচড়ে উঠে চলা শুরু করে। এবার আবিষ্কার করলাম এই বগিতে আমি একাই যাত্রী। ভয় ও আনন্দ দুটোই হচ্ছিল।

আমার পোলিশ সহকর্মী মিসেস বের্নাডেট জানিয়েছে, আমার দেশে যাচ্ছো যাও। তবে সুটেড-বুটেড হয়ে যেও না। আর ট্রেনের কর্মী ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে কিছু কিনবে না।

ইওরোপের প্রাণকেন্দ্রে এসে এ ধরনের সাবধান বাণী হাস্যকর মনে হলো।

বের্নাডেট বুঝতে পেরে জোর দিয়ে বললো, তোমার সঙ্গে আমি কৌতুক করছি না। ছিগয়না বা জিপশিরা বর্ডারে ট্রেন থামলে ঘড়ি অথবা স্বর্ণের চেইন বিক্রির উদ্দেশ্যে ওঠে। তারা একশ ইওরো দাম হেকে সবশেষে পাচ ইওরোতে বিক্রি করতে রাজি হয় এবং নেমে যাওয়ার আগে সুযোগ বুঝে অন্যের লাগেজ নিজের মনে করে নিয়ে চলে যায়।

বেশ কৌতূহল হলো। অনেকটা বাঙালি স্টাইল। একবার ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাচ্ছিলাম। পথে টঙ্গি বাজারের কাছে গতি একটু কমার সুযোগে নিখুত দক্ষতায় এক সাহসী যুবক জানালায় হাত থাকায় আমার ঘড়িটা ছো মারে। ততোধিক ক্ষিপ্রতায় হাত সরিয়ে নিলেও ঘড়িটা চেইন ছিড়ে এক সহযাত্রীর কপালে আঘাত করে। ছিনতাই না হলেও ঘড়ির অপমৃত্যু ঘটে।

রাতে ঘুমাবো না ঠিক করি। হাস্যকর হলেও সত্যি, কোকাকোলা বেশি পরিমাণে পান করলে আমার ঘুম আসে না আর মাথা ব্যথা হলে প্যারাসিটামলের প্রয়োজন হয় না।

ট্রেন ঘণ্টায় একশ কিলোমিটারের উপরে চলছে। চারদিকে বিস্তৃত মাঠ। অনেক দূরে ছোট খামার বাড়ি। এতো বিস্তীর্ণ ভূমির মালিকানা একজনের, ভাবতে অবাক লাগে! বাংলাদেশ হলে তো এই কৃষক *জমিদার* উপাধি পেতো কিংবা বারো ভূইয়ার একজন হতো!

নির্জন রাস্তা। আমাদের দেশের মতো রেললাইনের পাশ ঘেষে কোনো ঘরবাড়ি নেই। কিছুদূর যাওয়ার পর পাহাড় নজরে এলো। এমনিতে অস্ট্রিয়া-কে পাহাড়ের দেশ ভাবা হয়। ফিরোজ সাই-এর গান মনে পড়ে *দুই পাহাড়ের মাঝে মাওলায় মসজিদ বানাইছে*। এখানে দুই পাহাড়ের মাঝে সরকার রেললাইন বানিয়েছে।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে চেক (Czech) সীমান্ত এসে পড়ে। অনেক যাত্রী নেমে যায়, দুই একজন উঠলো। আমাকে একা দেখে এক মহিলা অন্যদিকে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর সিকিউরিটির লোক এলো। তাদের ভাষায় পাসপোর্ট দেখতে চাইলো। ইংরেজির ব্যবহার পূর্ব ইওরোপে খুব কম। অনুমানে ভর করে পাসপোর্ট বাড়িয়ে দেয়ার পর ভিসা দেখে *দোব্র* বলে চলে যায়।

অথচ গেল সপ্তাহে ঠিক এ জায়গা থেকে আমাকে ভিয়েনা-তে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। চেক-এর ভিসা ভিসা না থাকার কারণে। তাদেরকে যতোই বুঝিয়েছি পোল্যান্ডে যাচ্ছি, চেক-এ কোনো যাত্রাবিরতি করবো না, এমনকি ট্রেন থেকে নামবো না।

তাদের অনড় জবাব, ফেরত যেতে হবে।

ওদেরকে ভিসা দিতে বলেছিলাম।

ভাবলেশহীন উত্তর ছিল, ভিয়েনাতে চেক এমবাসি থেকে ভিসা নিতে হবে।

ভাগ্য ভালো। এবার সে রকম কিছু ঘটলো না।

আধঘণ্টা পর ট্রেন ছাড়লো। স্টেশন সংলগ্ন বিল্ডিং, গাড়ি ও মানুষের পোশাক-আশাক দেখে অস্ট্রিয়ার জীবনযাত্রার সঙ্গে চেকের পার্থক্য ধরা পড়ে। অনেকটা ইনডিয়া-বাংলাদেশের মতো।

ট্রেনের গতি বাড়তে থাকে। এখানে সব কৃষি জমি বরফে ঢাকা। যতোদূর চোখ যায়, শুভ্র শাদা বরফের চাদর। প্রকৃতির দুই ভিন্ন রূপ পৃথিবীর দুপ্রান্তে। ইওরোপে বছরের নির্দিষ্ট সময় চাষযোগ্য জমি বরফের কারণে অনাবাদি থাকে আর আমাদের দেশে বর্ষা মরসুমে প্রকৃতি ও ইনডিয়ার বদান্যতায় আবাদী জমি বন্যার পানিতে তলিয়ে যায়।

মোবাইলে মেসেজ আসার শব্দে ভাবনায় ছেদ পড়ে। চেক ও ইংরেজি ভাষায় আমাকে এ দেশে স্বাগত জানানো হয়েছে। পর পর দুটো দেশ পেরিয়ে এলাম, অথচ মাঠে কোনো গবাদি পশু বা কৃষক নজরে পড়েনি। পৃথিবীর সুন্দরতম দৃশ্যের মধ্যে একটি হলো সবুজ অথবা সোনালি ক্ষেতে কৃষক-কৃষাণীর কর্মব্যস্ততা।

কোণাকুণি লাল সূর্যের আবির্ভাব সন্ধ্যা নামার ইংগিত দেয়। একটু ঠাণ্ডা অনুভূত হওয়ায় হিটারের মাত্রা একটু বাড়িয়ে দরজা লক করে দিয়ে কফির ফ্লাস্ক নিয়ে বসি।

একা ট্রেনের বগিতে এই প্রথম নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হলো। ঢাকাতে দুটো জায়গা আমার বেশ প্রিয় ছিল। একটা হলো শাহবাগের পাবলিক লাইব্রেরি, অপরটা কমলাপুরের রেল স্টেশন। একাকী স্টেশনের বেঞ্চে অপরিচিত মানুষের চলে যাওয়া দেখতে বেশ লাগতো। ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যাওয়ার সময় কেন জানি না অজানা ব্যথা অনুভব করতাম। এবং মালগাড়ির নিথর চলে যাওয়ার শব্দে মনে হতো করুণ সুর কে যেন বলছে *যাচ্ছি যাচ্ছি, চলে যাচ্ছি*।

একাকী এই নিঃসঙ্গ ভ্রমণে হঠাৎ মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। বৃজের ওপর দিয়ে ট্রেন যাওয়ার শব্দে অন্যমনস্কতা ভাঙে। ট্রেনে বসে ট্রেনের চলে যাওয়া দেখতে ভালো লাগে।

দরজায় আলতো শব্দে খুলে দেখি ওয়েটার দাড়িয়ে।

রাতের খাবারের অর্ডর দিই।

খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই দ্বিতীয় দফা ভিসা চেক করতে আসে। লাগেজের দিকে নিরুদ্বিগ্ন দৃষ্টি রেখে ধন্যবাদ দিয়ে চলে যায়। চাদ বিহীন রাত অসহ্য মনে হয়। মাঝে মধ্যে দুই একটা তারার ঝলকানি দৃষ্টির সীমাবদ্ধতাকে পাশ কাটায়। এভাবে সকাল হয়। তবে সূর্যের দেখা মেলে না। শীতকালে ইওরোপে সূর্যের দেখা ভার।

পোল্যান্ডের সীমান্তে প্রবেশ করে ট্রেন। এখানে বোধহয় বসন্তকাল। সবুজ মাঠ, গাছে কচি পাতা, মাঠে সর্ষে ফুলের জ্বল জ্বলে হলুদ রঙ, কোথাও আবার সূর্যমুখীর চাষ করা হয়েছে সম্ভবত ভোজ্যতেল উৎপাদনের লক্ষ্যে। জনমানবহীন পরিবেশে পাহাড়ের গা ঘেষে সবুজ মাঠে অসংখ্য নাম না জানা ফুল ফুটে আছে যেন প্রকৃতি আপন ভাবনায় নিজেকে সাজিয়েছে। মনে হয় চিরসবুজের দেশ বাংলাদেশের সবুজ রঙ প্রকৃতি চুরি করে এদেরকে অকৃপণভাবে দান করেছে।

সকাল আটটায় ট্রেন ওয়ারসো স্টেশনে থামে। প্রচুর কর্মব্যস্ত মানুষ এখানে। চেহারায় নিরীহ ভাব। তবে জৌলুস নেই। কমিউনিজমের ছোয়া এখনো চোখে পড়ে। তাদের মাঝে আমাকে রিসিভ করতে আসে ছোট খালা নাজনীন। সঙ্গে বাংলাদেশি দূতাবাসের কর্মকর্তা, তার স্বামী।

ওদেরকে দেখে সারা রাতের ক্লান্তি উবে যায়। পরদেশে আপনজনের সান্নিধ্য সত্যিই মধুর। ট্রেন চলে যায় ওয়ার্কশপে, আমি ওয়ারসো–তে। মোবাইলে রিং বাজে, লেখা ওঠে *পোল্যান্ডে স্বাগতম*।

অস্ট্রিয়া থেকে
mohsinbhuian@msn.com

পরিচয়

- নিশাত নূর

২০০৪ সালের ঘটনা। পাচ দিনের ছোট একটা ট্রেনিং শেষ করে সিলেট থেকে ফিরবো সাভারের বাংলাদেশ লোক প্রশাসন ট্রেনিং কেন্দ্রে। আমাদের দলের বহর ষাটজনের। ট্রেনের একটা বগিতেই আমাদের ষাটজনের জন্য টিকেট করা হয়েছিল। ট্রেন সকাল সাড়ে দশটায়।

এ অধম ছাড়া দলের অন্য সবাই নির্ধারিত সময়ের বেশ আগেই স্টেশনে পৌছেছিল। জিন্দাবাজারে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেরি করে ফেললাম। হাপাতে হাপাতে দশটা পচিশ মিনিটে স্টেশনে গিয়ে পৌছালাম। কিন্তু একি! আমাদের জন্য নির্ধারিত বগিতে একটা সিটও খালি নেই। আমাদের ঊনষাটজন বসার পর ফাকা সিটগুলো অন্যান্য যাত্রীরা দখল করে বসেছে।

আমার কলিগরা একে অপরের মুখ চাওয়া–চাওয়ি করলো। কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে দৌড়ে গেলাম পাশের বগিতে পাছে সারা পথ দাড়িয়ে যেতে হয়!

পাশের বগিতে ঢুকেই দেখলাম একটা সিট ফাকা। মনে মনে আল্লাহকে কৃতজ্ঞতা জানালাম। সে সিটটার ঠিক পাশেই জানালার ধারে তাকিয়েই আমার চোখ স্থির। এক রূপসী তন্বী। মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো পূর্ণিমার আকাশে শ্রাবণ মেঘের ঘনঘটা। মেয়েটির সৌন্দর্য ঈর্ষনীয়। মনে হলো, এই সিটটা বিধাতা শুধু আমার জন্যই ফাকা রেখেছে।

বেগম রোকেয়া বলেছিলেন, *বাঙালি মুসলমানের রান্নাঘরের ঘ্রাণ পেলে ব্রাহ্মণেরও পৈতা ছেড়ার সাধ জাগে।* আমার কাছে মনে হলো –

লাজ–লজ্জার মাথা খাই

এর পাশেই বসে যাই।

এক্সকিউজ মি, এ সিটটাতে বসতে পারি? আমার সিট পাশের বগিতেই ছিল। কিন্তু...।

প্লিজ, বসুন।

থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ!

ওয়েলকাম!

খানিকক্ষণের নীরবতা।

লাজ–লজ্জার মাথা খাই।

শুরু করলাম।

আপনি কি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়েন?

জি না, আমি ইডেনে...।

ও... সরি! আমার এক কাজিন পড়ে ইডেনে। সে এবার থার্ড ইয়ারে, বাংলাতে অনার্স। আপনার সাবজেক্ট?

আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পড়ি, মাস্টার্স–এ।

আপনি?

গত বছর পড়াশোনা শেষ করেছি। ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন–এ। তারপর গত বছরই একুশতম বিসিএসএ অ্যাডমিন ক্যাডারে জয়েন করেছি। পোস্টিং...।

এখানে কোথায় এসেছিলেন?

একটা ট্রেনিং প্রোগ্রামে, বিআরডিটিআই–তে।

আমরা ছিলাম ডানপাশের সিট দুটোতে। কিছুক্ষণ পর আমাদের ঠিক সোজা বাম পাশের সিটের দিকে নজর গেল। সুদর্শন এক তরুণ ভদ্রলোকের চোখে চোখ পড়লো। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, আমার পাশে বসা রূপসী তন্বীর প্রতি ভদ্রলোকটির অগ্নিদৃষ্টি যেন কাছে পেলে তাকে গিলে খাবেন!

কথায় আছে, *চোরের মন পুলিশ পুলিশ*। ভাবলাম, মেয়েটি আমার সঙ্গে ভাব জমাচ্ছে বলে ভদ্রলোক হিংসায় জ্বলে মরছেন। কারণ আমি বসার আগেই তিনি যদি ওই সিটটাতে বসতেন, তাহলে হয়তো ওই ভাবটা তার সঙ্গেই জমতো! কিন্তু তিনি বোধহয় আমার মতো লাজ–লজ্জার মাথা খেতে পারেননি... তাই জ্বলেপুড়ে মরছেন। পাত্তা দিলাম না, বরং আলাপচারিতা আরো জমিয়ে দিলাম।

মাঝে মধ্যে তাকিয়ে দেখছিলাম লোকটার ক্রোধ যেন ক্রমেই বেড়ে চলছিল। মনে হচ্ছিল তার মুখের গ্রাস যেন কেউ কেড়ে নিচ্ছিল। মনে মনে বললাম, *গাছে বেল পাকলে তাতে কাকের কি?*

ভ্রমণটা যেন স্বপ্নের মতো মনে হলো। কখন যে উত্তরা স্টেশনে এসে পৌছালাম টেরই পাইনি। আমাকে নামতে হবে এ স্টেশনেই। মেয়েটি নামবে কমলাপুরে। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। মনে হলো, লাজ-লজ্জার মাথা যখন খেয়েছিই তখন কোনো অজুহাতে কমলাপুরে নামলেই বা ক্ষতি কি?

না! আর লোভ করলাম না। কারণ আমি জানি *অতি লোভে তাতি নষ্ট!* সুতরাং চরম অনিচ্ছা সত্ত্বেও নেমে পড়ার জন্য উদ্যত হলাম।

ইতিমধ্যে অনেক যাত্রীই নেমে পড়েছে। ট্রাভেল ব্যাগটা হাতে নিয়ে সিট ছেড়ে উঠে দাড়ালাম। মেয়েটিকে বিদায় সম্ভাষণ জানানোর জন্য তৈরি হলাম।

এমন সময় অবাক কাণ্ড! মেয়েটি সেই হিংসুটে ভদ্রলোকটাকে খানিকটা আদর এবং খানিকটা শাসন মিশ্রিত কণ্ঠে ডেকে বললো, এবার এখানে এসে বসো।

আমি তো হতবাক! সংবিৎ ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম, ভদ্রলোক কে?

আমার হাজব্যান্ড।

বরগুনা থেকে

রক্ষক যখন ভক্ষক

– মুহাম্মদ মিজানুর রহমান সাজু

কোনো এক বিকেলে বাড়ি যাবার উদ্দেশ্যে রাজশাহী-টু-পার্বতীপুর *বরেন্দ্র এক্সপ্রেস*-এ উঠি। ট্রেনটি বিকাল তিনটায় রাজশাহী ছেড়ে রাত সাড়ে আটটায় পার্বতীপুর পৌছায়। পার্বতীপুর নেমে দেড় ঘণ্টা যাত্রাবিরতি দিয়ে লোকাল ট্রেনে চেপে রাত দশটায় যাত্রা শুরু করি।

লোকাল ট্রেন। ট্রেনে বাতি-আলো কিছুই নেই। মাঝে মধ্যে ধূমপায়ীদের কল্যাণে বিড়ির আগুন চোখে পড়ে। এমন সময় আমার এই কাহিনীর নায়ক যাকে কেন্দ্র করে আমার এই লেখা তিনি এলেন। আর কেউ নন, তিনি হলেন টিটি।

তিনি সকল যাত্রী সাধারণের কাছ থেকে টিকেটের নাম করে দুই টাকা থেকে শুরু করে যা পাচ্ছেন পকেটে ভরছেন। যথানিয়মে আমার কাছে এসে টিকেট চাইলেন।

বললাম টিকেট করিনি।

তিনি বললেন, দশ টাকা দাও।

কেন?

টিকেট করোনি, তাই।

আমি দশ টাকা দিলে তিনি তা নিয়ে পকেটে ভরে চলে যাচ্ছিলেন।

বললাম, টাকা নিলেন, টিকেট দিয়ে যান।

টিকেট নিতে আরো পাচ টাকা লাগবে।

তিনি ধরেই নিয়েছিলেন পাচ টাকা দেবো না, টিকেটও নেবো না।

দ্রুত ভাবলাম এখন যদি পাচ টাকা না দিই তাহলে ওই টাকা সরকার পাবে না, বরং তিনি ওই টাকা ভোগ করবেন। পাচ টাকা দিলে তিনি টিকেট তৈরি করে দিতে বাধ্য থাকবেন। যদিও ওই সময় আমার পকেটে খুব একটা টাকা ছিল না। টাকা ছিল বিশটি। তারপরও স্টেশনে নেমে গভীর রাতে রিকশাযোগে পনেরো টাকা ভাড়া দিয়ে বাড়ি পৌছার কথা আমাকে ভাবতে হয়েছে।

এমনি সাতপাচ ভেবে দ্রুত ওনাকে পাচ টাকা দিলে তিনি এক রকম অপ্রস্তুত হয়ে আমাকে পার্বতীপুর–টু–কাউনিয়া পনেরো টাকার টিকেট তৈরি করে দিলেন।

সেদিন আমার ভাবতে কষ্ট হয়েছিল, টিটি কি করে যাত্রী সাধারণকে টিকেট করতে উৎসাহিত না করে বরং নিরুৎসাহিত করে।

সেদিনই আমি জেনে গেছি, এ কারণেই বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা লোকসান দেয়।

রাজশাহী থেকে

বিকৃত

- তুহিন

ঢাকা–চট্টগ্রাম রেললাইনের নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার একেবারে পূর্বাঞ্চল দৌলতকান্দি রেলস্টেশন। এর পূর্বদিকে ঠিক পরেরটাই ভৈরব বাজার রেলওয়ে জাংশন। আর ওই ভৈরবেই আমার বাবার শ্বশুরবাড়ি। মানে আমার নানাবাড়ি।

তখনকার যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থা ততোটা উন্নত ছিল না বিধায় ভৈরব যাতায়াতে ট্রেনই ছিল প্রধান মাধ্যম। মা আমাকে আদর করে কোলেপিঠে আগলে আমাদের পাড়া–গা আলগী থেকে দেড় মাইল পায়ে হেটে দৌলতকান্দি এসে ট্রেনে চড়ে তার পিত্রালয়ে আসতেন। সুতরাং বলা চলে, ট্রেনের সঙ্গে যোগসূত্রটা আমার জন্মলগ্ন থেকেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

কিশোর বয়সে সম্ভবত ১৯৮১ সালে আমার প্রয়াত বাবার মুখে তখনকার ঢাকা জাদুঘর, চিড়িয়াখানা ও নবাববাড়ি অর্থাৎ আহসান মঞ্জিলের নানান কাহিনী শুনে ঢাকা আসার বায়না ধরলে আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন এবং অতিশয় ভ্রমণ বিলাসী ভালো মানুষ আব্বা অতি সহজেই রাজি হলেন।

অবশ্য এর আগেও কয়েকবার ক্যান্টনমেন্টে দুই খালুজানের কোয়ার্টারে বেড়িয়েছি। তবে সেসব স্মৃতি আজ আর তেমন মনে নেই।

নির্দিষ্ট করে কিছু ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান পরিভ্রমণ তথা অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা ও অদেখাকে দেখার দুর্বার আকঙ্ক্ষা আর অদম্য বাসনাকে পুলকিত চিত্তে কোনো এক কাকডাকা ভোরে বিছানা ছেড়ে আব্বার সঙ্গে রওনা দিলাম।

ট্রেনের নাম জানি না। তবে অনুমান করি ওটা ছিল আখাউড়া টু ঢাকাগামী *এসএস কার*।

আমি বাচ্চা মানুষ বিধায় আব্বা শুধু ওনারই টিকেট কেটে দৌলতকান্দি থেকে ট্রেনে উঠলেন আমাকে নিয়ে। সৌভাগ্যক্রমে বসার জন্য আব্বা একটি আসনও পেয়ে গেলেন।

পশ্চিমমুখী ট্রেনযাত্রায় আব্বার সিট দক্ষিণ পাশে জানালা ঘেষে। উত্তরমুখো হয়ে বসা মাঝ বয়সী পাজামা–পাঞ্জাবি পরিহিত কিন্তু শ্মশ্রুমণ্ডিত আমার প্রিয় বাবার সেদিনের চমৎকার সেই মুখখানি আজো আমার চোখে উজ্জ্বল তারার মতো জ্বলজ্বল করে ভেসে ওঠে।

বসলাম আব্বার কোলে। আব্বার ঠিক বামপাশেই একই ড্রেস পরা কিন্তু থুতনিতে হালকা দাড়ি এবং ওষ্ঠের ওপরে উভয়পাশেই চিকন গোফধারী মধ্যম গড়নের যাত্রীটি। টুপিহীন কারো কেশভর্তি মাথাতে কাঠমোল্লার মতোই লাগছিল। এখন আন্দাজ করি লোকটার বয়স তখন ত্রিশের কোঠাতে ছিল।

যথাসময়ে ট্রেন ছাড়ার মাধ্যমে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। রাতের আধার ভেদ করে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। প্রতিটি স্টেশনেই ট্রেনের যাত্রা বিরতিতে যাত্রীদের ওঠানামার কারণে ভিড় ঠেলাঠেলি লেগেই আছে। প্রচণ্ড ধাক্কাধাক্কির মধ্যেও সুবোধ বালকটির মতো চুপচাপ আব্বার কোলে বসে আছি।

এক পর্যায়ে মেথিকান্দা স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়তেই পাশে বসা ওই হুজুর যেন ভদ্রতা দেখাতেই আব্বার কাছ থেকে আমাকে টেনে ওনার কোলে নিয়ে বসালেন। অত্যধিক ভিড়ে কেউ কারো দিকে তাকানোরও যেন সুযোগ নেই।

লোকটি তার ডান হাতে আমার পেট বরাবর প্যাচিয়ে ধরে হাসি মুখে শান্ত–ক্ষীণ কণ্ঠে কোথায় যাচ্ছি প্রশ্ন করলে জবাব দিলাম ঢাকা যাচ্ছি। এভাবেই টুকিটাকি কথা বলে খাতির জমালেন।

এই এক পর্যায়ে টের পেলাম ওনার বাম হাতর তালুর নিচে ডান হাত রেখে এমনভাবে সুকৌশলে ডান হাতের আঙুলগুলো দিয়ে আমার শর্ট প্যান্টের নিচে লুকিয়ে থাকা সোনার চেয়েও খাটি সেদিনের সেই কচি সোনা (মন্থনদণ্ড, শিশ্ন, লিঙ্গ যা ইচ্ছা তাই ব্যবহার করতে পারেন)–টাকে নাড়িয়ে যাচ্ছেন। কখনো আঙুল দ্বারা সঞ্চালন ক্রিয়া আবার কখনো বা অগ্রভাগের বাড়তি পাতলা চামড়াটাকে যেটি তখনো কেটে ফেলা হয়নি ওনার বৃদ্ধ ও তর্জনী অঙুলিদ্বয় দ্বারা দলন, মর্দন, রগড়িয়ে যাচ্ছেন।

অদ্ভুত ওই আচরণে আমি কিছু ভয় কিছু লাজ এবং কেমন যেন এক ধরনের সুড়সুড়ি ও শিহরণ অনুভব করছিলাম। আমার নির্বাক অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি আরো বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনাতে হস্তচালনা করে যাচ্ছেন। কচি শিশু বয়স আমার। কতোই বা বয়স হবে? আট নয়। ডানপিটে বা দুরন্ত প্রকৃতির কখনোই ছিলাম না, এখনো নই। তাই সেদিনের নীরবতার সুবাদে কমলাপুর নামার আগ পর্যন্ত মানুষটি তার বিকৃত রুচি চরিতার্থ করতে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে গেলেন বিরতিহীনভাবে।

এখন এই পরিপূর্ণ যৌবনকালে এসে মাঝে মধ্যে যখন অতীতের ঘটে যাওয়া সেই দুঃস্মৃতিটা মনে পড়ে তখন এই ভেবে ভয়ে গুটিয়ে যাই।

আলগী, নরসিংদী থেকে